ফ্রেডারিক এঙ্গেলস
ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র
১৮৯২ সালের ইংরাজি সংস্করণের জন্য বিশেষ ভূমিকা

বর্তমানের এই ছোট পুস্তিকাটি মূলত একটি বৃহত্তর রচনার অংশ। ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের privatdocent ডাঃ ও. দ্যুরিং সহসা এবং খানিকটা সরবে সমাজতন্ত্রে তাঁর দীক্ষাগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন ও জার্মান জনসাধারণের কাছে একটা বিস্তারিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বই শুধু নয়, সমাজপুনর্গঠনের একটা সুসম্পূর্ণ ব্যবহারিক ছকও হাজির করেন। বলাই বাহুল্য, উনি তাঁর পূর্ববর্তীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ; সর্বোপরি মার্কসকে পাকড়াও করে তাঁর পুরো ঝাল ঝাড়েন।

ঘটনাট ঘটে প্রায় সেই সময় যখন জার্মানির সোশ্যালিস্ট পার্টির দুটি অংশ, আইজেনাখীয় ও লাসালীয়রা সবে মিলিত হয়েছে এবং তাতে করে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেছে তাই নয়, অধিকন্তু তার সমগ্র শক্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। জার্মানির সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্রুত একটা শক্তি হয়ে উঠছিল। কিন্তু শক্তি হয়ে ওঠার প্রথম সর্তই ছিল, এই নবার্জিত ঐক্যকে বিপন্ন করা চলবে না। ডাঃ দ্যুরিং কিন্তু প্রকাশ্যেই তাঁর চারিপাশে একটি জোট পাকাতে শুরু করেন, একটি ভবিষ্যৎ পৃথক পার্টির ত বীজ। সুতরাং প্রয়োজন হয় আহ্বান গ্রহণ করে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চালানোর, চাই বা না চাই।

কাজটা অতি দুষ্কর না হলেও স্পষ্টতই এক দীর্ঘ ঝামেলার ব্যাপার। এ কথা সুবিদিত যে, আমরা জার্মানর হলাম সাঙ্ঘাতিক রকমের গুরুভার Grundlichkeit-এর ভক্ত — তাকে র‍্যাডিক্যাল প্রগাঢ়ত্ব অথবা প্রগাঢ় র‍্যাডিক্যালত্ব যা খুশি বলুন। আমাদের কেউ যখন তাঁর বিবেচনানুসারে যা নতুন মনে হচ্ছে এমন একটি মতবাদ বিবৃত করতে চান, তখন সর্বাগ্রে সেটিকে একটি সর্বাঙ্গীন মতধারায় পরিপ্রসারিত করতে হবে তাঁকে। প্রমাণ করে দিতে হবে যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম সূত্রটি থেকে বিশ্বের মৌলিক নিয়মগুলি সবই যে অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান, তার পেছনে শুধু শেষ পর্যন্ত এই নবাবিষ্কৃত মুকুটমণি তত্ত্বটিতে পৌঁছন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এবং এদিক থেকে ডাঃ দ্যুরিং একান্তই জাতীয় মানোত্তীর্ণ। একছিটে কম নয় একেবারে সুসম্পূর্ণ একটা 'দর্শন-ব্যবস্থা' — মনোজাগতিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ; সুসম্পূর্ণ একটা 'অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা' ; এবং পরিশেষে 'অর্থশাস্ত্রের বিচারমূলক ইতিহাস' — অক্টাভো সাইজের তিনটি মোটা মোটা খণ্ড, আকার ও প্রকার উভয়তঃ গুরুভার, সাধারণভাবে পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মার্কসের বিরুদ্ধে তিন অক্ষৌহিণী যুক্তি, মোটকথা একট পরিপূর্ণ 'বিজ্ঞান বিপ্লবের' প্রচেষ্টা, এরই মোকাবিলা করতে হত। আলোচনা করতে হত সম্ভাব্য সবকিছু প্রসঙ্গ : স্থান কালের ধারণা থেকে Bimetallism পর্যন্ত ; বস্তু ও গতির চিরন্তনতা থেকে নৈতিক ভাবনার মরণশীল প্রকৃত ; ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ সমাজে তরুণদের শিক্ষা — সব। যাই হোক, আমার প্রতিবাদীর ধারাবাহিক সর্বাঙ্গীনতার ফলে এই অতি বিভিন্ন সব প্রসঙ্গে মার্কস ও আমার যা মতামত সেগুলিকে দ্যুরিং-এর বিপরীতে, এবং এযাবৎ যা করা হয়েছে তার চেয়ে আরো সুসম্বন্ধ আকারে বিকশিত করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। অন্যথায়-অকৃতার্থ এ কর্তব্যগ্রহণে সেই ছিল আমার প্রধান কারণ।

আমার জবাব প্রথমে প্রকাশিত হয় সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান মুখপত্র লাইপজিগ Vorwarts*১ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিসাবে এবং পরে "Herrn Eugen Duhrings Umwalzung der Wissenschaft" (শ্রী ও. দ্যুরিং-এর 'বিজ্ঞান বিপ্লব') নামক পুস্তকাকারে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুরিখে ১৮৮৬ সালে।

সুহৃদ্বর এবং অধুনা ফরাসী প্রতিনিধি সভায় লিল্ প্রতিনিধি পল লাফার্গের অনুরোধে এ বইয়ের তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পুস্তিকাকারে সাজিয়ে দিই। তিনি তা অনুবাদ করে ১৮৮০ সালে "Socialisme utopique et Socialisme scientifique" ('ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র') নামে প্রকাশ করেন। এই ফরাসী পাঠ থেকে একটি পোলীয় ও একটি স্পেনীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে আমাদের জার্মান বন্ধুরা পুস্তিকাটিকে মূল ভাষায় প্রকাশ করেন। জার্মান পাঠের ওপর ভিত্তি করে ইতালীয়, রুশ, দিনেমার, ওলন্দাজ, রুমানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ইংরাজি সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকাটি তাহলে দশটি ভাষায় প্রচলিত হল। আর কোনো সমাজতান্ত্রিক পুস্তক এত বেশি অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই, এমনকি আমাদের ১৮৪৮ সালের 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার' বা মার্কসের 'পুঁজি' বইটিও নয়। জার্মানিতে এ বইটির চারটি সংস্করণ হয়েছে, সর্বসমেত ২০,০০০ কপি।

'মার্ক', *২ এই সংযোজনী লেখা হয়েছিল জার্মানিতে ভূমি সম্পত্তির ইতিহাস ও বিকাশের কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। একাজ তখন বিশেষ জরুরী ঠেকেছিল কারণ সে পার্টির দ্বারা শহুরে মজুরদের অঙ্গীভবন তখন বেশ সম্পূর্ণতার দিকে, পালা এসেছে ক্ষেতমজুর ও চাষীদের। অনুবাদে এ সংযোজনী রেখে দেওয়া হয়েছে, কেননা সমস্ত টিউটোনিক জাতির পক্ষে যা একই সেই ভূমি-ব্যবস্থার আদি ধরনটা

এবং তার অবক্ষয়ের ইতিহা জার্মানির চেয়েও ইংলন্ডে কম সুবিদিত। লেখাটি মূলে যা ছিল তাই রেখে দিয়েছি, মাক্সিম কভালেভস্কি সম্প্রতি যে প্রকল্প দিয়েছেন তার কথা উল্লেখ করা হয়নি ; এই প্রকল্প অনুসারে মার্ক-এর সভ্যদের মধ্যে আবাদী ও চারণভূমির বাঁটোয়ারা হয়ে যাবার আগে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে এগুলির চাষ হত এজমালি হিসাবে এক একটি বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠী দ্বারা (অদ্যাবধি বর্তমান দক্ষিণ স্লাভোনীয় জাদ্রুগা তার দৃষ্টান্তস্থানীয়), বাঁটোয়ারাটা হয় পরে, যখন গোষ্ঠী বৃদ্ধি পায়, ফলে এজমালি হিসাবে পরিচালনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কভালেভস্কির বক্তব্য হয়ত ঠিকই, কিন্তু বিষয়টা এখনো sub judice*৩।

এ বইয়ে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পরিভাষার মধ্যে যেগুলি নতুন সেগুলি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির ইংরাজি সংস্করণ অনুযায়ী। 'পণ্যোৎপাদন' আমরা সেই অর্থনৈতিক পর্যায়কে বলছি যেখানে সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে কেবল উৎপাদকের ভোগের জন্য শুধু নয়, বিনিময়ের জন্যও ; অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিসাবে নয়, পণ্য হিসাবে। বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এই পর্যায়টা প্রসারিত ; তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনেই, অর্থাৎ সেই অবস্থায়, যখন উৎপাদন-উপায়ের মালিক পুঁজিপতি মজুরি দিয়ে নিয়োগ করে শ্রমিকদের, শ্রমশক্তি ছাড়া যারা উৎপাদনের সর্ববিধ উপায় থেকে বঞ্চিত তাদের, এবং সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য থেকে তার লগ্নীর ওপর যেটা উদ্বৃত্ত হয় সেটি পকেটস্থ করে। মধ্য যুগ থেকে ধরে শিল্পোৎপাদনের ইতিহাসকে আমরা তিনটি যুগে ভাগ করি : ১) হস্তশিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে ওস্তাদ কারুশিল্পী ও তদধীনস্থ জনকয়েক কর্মী ও সাকরেদ, প্রত্যেক শ্রমিকই সেখানে পুরো সামগ্রীটাই তৈরি করে ; ২) কারখানা (manufacture), যেখানে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়ে সম্পূর্ণ সামগ্রীটা উৎপাদন করে শ্রমবিভাগ নীতিতে, প্রত্যেকটা শ্রমিক করে শুধু এক একটা আংশিক কাজ যাতে সামগ্রীটা সম্পূর্ণ হয় শুধু পর পর প্রত্যেকের হাত ফেরতা হয়ে যাবার পর ; ৩) আধুনিক যন্ত্রশিল্প, যেখানে মাল তৈরি হয় শক্তি-চালিত যন্ত্র দ্বারা আর শ্রমিকের কাজ শুধু যন্ত্রের ক্রিয়ার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

আমি বেশ জানি যে, এ বইয়ের বিষয়বস্তুতে বৃটিশ পাঠক সাধারণের একটা বড়ো অংশের আপত্তি হবে। কিন্তু আমরা, কন্টিনেন্ট-বাসীরা যদি বৃটিশ 'শালীনতা' রূপ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র ধারও ধারতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা যা আছে তা আরো শোচনীয় হত। আমরা যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বলি, এ বইয়ে তাকেই সমর্থন করা হয়েছে আর 'বস্তুবাদ' শব্দটাই বৃটিশ পাঠকদের বিপুল অধিকাংশের কানে বড়ো বেঁধে। 'অজ্ঞেয়বাদ'*৪ তবু সহনীয়, কিন্তু বস্তুবাদ একেবারেই অমার্জনীয়।

অথচ সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমস্ত বস্তুবাদেরই আদি ভূমি হল ইংলন্ড।

'বস্তুবাদ গ্রেট বৃটেনের আত্মজ সন্তান। বৃটিশ স্কলাস্টিক দুনস স্কোট*৫ তো আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, "বস্তুর পক্ষে ভাবনা কি অসম্ভব ?"

'এই অঘটন-ঘটনের জন্য তিনি আশ্রয় নেন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অর্থাৎ তিনি ধর্মতত্ত্বকে লাগান বস্তুবাদের প্রচারে। তদুপরি তিনি ছিলেন নামবাদী। নামবাদ*৬, বস্তুবাদের প্রাথমিক এই রূপ প্রধানত দেখা যায় ইংরেজ স্কলাস্টিকদের মধ্যে।

'ইংরাজি বস্তুবাদের আসল প্রবর্তক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হল একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান ভাগ। আনাক্সেইগরস এবং তাঁর homoiomeriae, ডিমোক্রিটস এবং তাঁর পরমাণুর কথা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন তাঁর প্রামাণ্য হিসাবে। তাঁর বক্তব্য, ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের মূলাধার। সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-দত্ত তথ্যকে যুক্তিসম্মত প্রণালীতে বিচার করাই হল বিজ্ঞানের কাজ। অনুমান, বিশ্লেষণ, তুলনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা হল এই ধরনের যুক্তিসম্মত প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণে মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল গতি, যান্ত্রিক ও গাণিতিক গতিই শুধু নয়, প্রধানত একটা উদ্বেগ (impulse), একটা সজীব প্রেরণা, একটা টান, অথবা ইয়াকব ব্যেমের কথা অনুসারে — বস্তুর একটা বেদনা (qual)*৭।

'বস্তুবাদের প্রথম স্রষ্টা বেকন, একটা সর্বাঙ্গীন বিকাশের বীজ তখনো তাঁর বস্তুবাদে অন্তর্নিহিত। একদিকে ইন্দ্রিয়গত কাব্যময় ঝলকে পরিবৃত বস্তু যেন মানবের সমগ্র সত্তাকে আকৃষ্ট করছিল মোহিনী হাসি হেসে। অন্যদিকে অ্যাফরিজম-প্রভাবে সূত্রবদ্ধ মতবাদ ধর্মতত্ত্বের অসঙ্গতিতে পল্লবিত হয়ে উঠছিল।

'পরবর্তী বিকাশে বস্তুবাদ হয়ে ওঠে একপেশে। বেকনীয় বস্তুবাদকে যিনি গুছিয়ে তোলেন তিনি হব্‌স। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞান তার কাব্য মায়া হারিয়ে গাণিতিকের বিমূর্ত অভিজ্ঞতার করায়ত্ত হল ; বিজ্ঞানের রাণী বলে ঘোষণা করা হল জ্যামিতিকে। বস্তুবাদ আশ্রয় নিল মানবদ্বেষে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানবদ্বেষী দেহহীন অধ্যাত্মবাদকে যদি তারই স্বভূমিতে পরাস্ত করতে হয়, তাহলে বস্তুবাদকেও তার দেহ দমন করে যোগী হতে হয়। এই ভাবে ইন্দ্রিয়গত সত্তা থেকে তার পরিণতি হল বুদ্ধিক সত্তায় ; কিন্তু এ ভাবেও, বুদ্ধির যা বৈশিষ্ট্য সেই অনুসারে, ফলাফলের হিসাব না করে সবকটি সঙ্গতিকেই তা বিকশিত করে তোলে।

'বেকনের অনুবর্তক হিসাবে হব্‌সের বক্তব্য এই : সমস্ত মানবিক জ্ঞান যদি পাই ইন্দ্রিয় থেকে তাহলে আমাদের ধারণা ও প্রত্যয়গুলি তাদের ইন্দ্রিয়গত রূপ থেকে, বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছায়ারূপ ছাড়া কিছু নয়। দর্শন শুধু কেবল তাদের নামকরণ করতে পারে। একই নাম প্রযুক্ত হতে পারে একাধিক ছায়ারূপে। নামেরও নাম থাকতে পারে। স্ববিরোধ দেখা দেবে যদি আমরা একদিকে বলি যে, সমস্ত ধারণার উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে এবং অন্যদিকে বলি, শব্দটা শব্দেরও অতিরিক্ত কিছু, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত যে সত্তাগুলি সকলেই এক একটি একক, সেগুলি ছাড়াও একক নয় সাধারণ চরিত্রের সত্তা বর্তমান। দেহহীন বস্তুর মতোই দেহহীন সত্তাও আজগুবি। দেহ, বস্তু, সত্তা হল একই বাস্তবের বিভিন্ন নাম। চিন্তক বস্তু থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।*৮ জগতে যে পরিবর্তন চলেছে তা সবের অধঃস্তর হল এই বস্তু। অসীম কথাটা অর্থহীন যদি না বলা হয় যে, অবিরাম যোগ দিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের মনের আছে। কেবল বস্তুময় জগথ আমাদের বোধগম্য বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা আমাদের সম্ভব নয়। একমাত্র আমার নিজস্ব অস্তিত্বই নিশ্চিত। মানবিক প্রতিটি আবেগই হল একটা যান্ত্রিক সঞ্চলন যার একটা শুরু ও একটা শেষ আছে। যাকে আমরা কল্যাণ বলি তা হল চিত্তাবেগের (impulse) লক্ষ্য। প্রকৃতির মতো মানুষও একই নিয়মের অধীন। ক্ষমতা ও স্বাধীনতা একই কথা।

'হব্‌স বেকনকে গুছিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে সমস্ত মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব, বেকনের এই মূলনীতির কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি। সে প্রমাণ দেন লক তাঁর "মানবিক বোধ বিষয়ে নিবন্ধ"এ।

'বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্যবাদী*৯ কুসংস্কার ছিন্ন করেছিলেন হব্‌স। লকের ইন্দ্রিয়বাদের মধ্যে যে ধর্মতত্ত্বের অবশেষ তখনো থেকে গিয়েছিল তাকে একই ভাবে ছিন্ন করেন কলিন্স, ডডওয়েল, কাউয়ার্ড, হার্টলি, প্রিস্টলি। ব্যবহারিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার সহজ পদ্ধতি হল শেষ পর্যন্ত Deism*১০।'*১১

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বইটির পুরো নাম : Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten (পবিত্র পরিবার বা বিচারমূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের ও কোম্পানির বিরুদ্ধে)। — সম্পাঃ

আধুনিক বস্তুবাদের বৃটিশ উৎস বিষয়ে এই হল মার্কসের লেখা। ইংরেজদের পূর্বপুরুষদের মার্কস যে প্রশংসা করেছিলেন সেটা যদি আজকাল তাদের তেমন রুচিকর না লাগে তবে আক্ষেপেরই কথা। কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই যে, বেকন, হব্‌স ও লকই হলেন ফরাসী বস্তুবাদদের সেই চমৎকার ধারাটির জনক যার দরুন, ফরাসীদের ওপর ইংরেজ ও জার্মানরা স্থল ও নৌযুদ্ধে যত জয়লাভই করুক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দী পরিণত হয় প্রধানত এক ফরাসী শতাব্দীতে এবং তা হয় পরিণামের সেই ফরাসী বিপ্লবেরও আগে যার ফলশ্রুতি ইংলন্ড ও জার্মানির আমরা, বাইরের লোকেরা, আজো পর্যন্ত আত্মস্থ করতে চেষ্টিত।

এ কথা অনস্বীকার্য। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদগ্ধ যে বিদেশীরা ইংলন্ডে এসে বসবাস শুরু করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই যে জিনিসটা চোখে পড়েছে সেটাকে তাঁরা 'ভদ্র' ইংরেজ মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য। আমরা সে সময় সকলেই ছিলাম হয় বস্তুবাদী নয় অন্ততপক্ষে অতি র‍্যাডিক্যাল স্বাধীন-চিন্তক, এবং ইংলন্ডের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকেই যে যতোরকম অসম্ভাব্য অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবেন, বাকল্যান্ড ও মানটেলের মতো ভূতাত্ত্বিকরাও বিজ্ঞানের তথ্যকে বিকৃত করে বিশ্বসৃষ্টির পুরান-কাহিনীর সঙ্গে খুব বেশি সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাইবেন না, তা আমাদের কাছে অকল্পনীয় লেগেছিল। অন্যপক্ষে, ধর্মীয় প্রসঙ্গে যাঁরা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগে সাহসী এমন লোকের সন্ধান পেতে হলে যেতে হত অবিদ্বানদের মধ্যে, তখন যাঁদের বলা হত 'অধৌত জনগণ' সেই তাঁদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ওয়েনপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে।

কিন্তু অতঃপর ইংলন্ড 'সুসভ্য' হয়েছে। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনী থেকে আত্মপর ইংরাজি বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। ধীরে ধীরে ইংলন্ডের আন্তর্জাতীয়করণ হয়েছে খাদ্যে, আচার-আচারণে, ভাবনায় ; এতটা পরিমাণে হয়েছে যে ইচ্ছে হয় বলি, কন্টিনেন্টের অন্যান্য অভ্যাস এখানে যেমন চালু হয়েছে তেমনি কিছু ইংরাজি আচার-ব্যবহার কন্টিনেন্টেও সমান চালু হোক। যাই হোক, স্যালাড-তেলের প্রবর্তন ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে (১৮৫১ সালের আগে তা কেবল অভিজাতদের কাছেই সুবিদিত ছিল) ধর্ম বিষয়ে কন্টিনেন্টসুলভ সন্দেহবাদেরও একটা মারাত্মক প্রসার ঘটেছে ; এবং তা এতদূর গড়িয়েছে যে, চার্চ অব ইংলন্ডের মতো ঠিক অতোটা 'এই-তো-চাই' বলে এখনো গণ্য না হলেও অজ্ঞেয়বাদ শালীনতার দিক থেকে প্রায় ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের সমতুল্য এবং নিশ্চিতই 'স্যালভেশন আর্মির'*১২ চেয়ে উচ্চে। না ভেবে পারি না যে, এই অবস্থায় অধর্মের এ প্রসারে যাঁরা আন্তরিকভাবেই ক্ষুব্ধ ও তার নিন্দা করেন, তাঁরা এই জেনে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, এই সব 'নয়া হালফিল ধারণাগুলো' বিদেশী বস্তু নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রীর মতো Made in Germany বস্তু নয়, বরং নিঃসন্দেহেই তা সাবেকি বিলাতী, এবং উততরপুরুষেরা এখন যতটা সাহস করে না দুশ বছর আগে তার চেয়েও অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাঁদের বৃটিশ আদিপুরুষেরা।

বস্তুতপক্ষে, 'সসঙ্কোচ' বস্তুবাদ ছাড়া অজ্ঞেয়বাদ আর কী ? প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীর ধারণা আগাগোড়া

বস্তুবাদী। সমগ্র প্রাকৃতিক জগত নিয়ম-চালিত, বাইরে থেকে তার ক্রিয়ায় কোনো হস্তক্ষেপের কথা একেবারে ওঠে না। কিন্তু, অজ্ঞেয়বাদী যোগ করে, জ্ঞাত বিশ্বের অতিরিক্ত কোনো পরম সত্তার অস্তিত্ব নিরূপণের অথবা খন্ডনের কোনো উপায় আমাদের নেই। এ কথা হয়ত বা খাটত সেকালে যখন সেই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর Mecanique celeste*১৩ গ্রন্থে স্রষ্টার উল্লেখ নেই কেন, নেপোলিয়নের এই প্রশ্নে লাপ্লাস সগর্বে জবাব দেন, "Je n'avais pas besoin de cette hypothese"*১৪। কিন্তু আজকাল, বিশ্বের বিবর্তনী ধারণায় স্রষ্টা বা নিয়ন্তার কোনো স্থানই নেই ; সমগ্র বর্তমান বিশ্ব থেকে পরিবিচ্ছিন্ন এক পরম সত্তার কথা বলা স্ববিরোধসূচক, এবং আমার মনে হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি একটা অকারণ অপমান।

অপিচ, আমাদের অজ্ঞেয়বাদী মানেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়দত্ত সংবাদ। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদী যোগ করেন, ইন্দ্রিয়ের মারফত যে বস্তুর বোধ হচ্ছে তার সঠিক প্রতিচ্ছবিই যে ইন্দ্রিয় আমাদের দিয়েছে তা জানলাম কী করে? অতঃপর অজ্ঞেয়বাদী আমাদের জানিয়ে দেন, বস্তু বা তার গুণের কথা তিনি যখন বলেন তখন তিনি আসলে সেই সব বস্তু বা গুণেরই কথা বলছেন না, নিশ্চিত করে তার কিছু জানা সম্ভব নয়, স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ওপর তারা যে ছাপ ফেলেছে শুধু তারই কথা বলছেন। এ ধরনের কথাকে কেবল যুক্তি বিস্তার করে হারান বোধ হয় সত্যিই শক্ত। কিন্তু যুক্তি বিস্তারের আগে হল ক্রিয়া। Im Anfang war die Tat।*১৫ এবং মানবিক প্রতিভা কর্তৃক এ সমস্যা আবিষ্কারের আগেই মানবিক কর্ম দ্বারা তার সমাধান হয়ে গেছে। পুডিং-এর প্রমাণ তার ভক্ষণে। এই সব বস্তুর অনুভূত গুণাগুণ অনুসারে বস্তুটা আমাদের কাজে লাগালেই আমাদেরইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির সঠিকতা বা বেঠিকতার একটা নির্ভুল যাচাই হয়ে যায়। আমাদের এই অনুভূতিগুলি যদি ভুল হত, তাহলে সে বস্তুর ব্যবহার-যোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের হিসাবও ভুল হতে বাধ্য এবং সব চেষ্টা বিফল হত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে যদি আমরা সক্ষম হই, যদি দেখা যায় যে, বস্তুটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার সঙ্গে সে বস্তু মিলছে, বস্তুটার কাছ থেকে যে কাজ আশা করছি তা হাসিল হচ্ছে, তাহলেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে বস্তু এবং তার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি ততটা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে আমাদের বহিঃস্থিত বাস্তবের সঙ্গে। যদি বা বিফলতার সম্মুখীন হই, তাহলে সে বিফলতার কারণ বার করতে দেরি হয় না ; দেখা যায়, যে অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছি সেটা হয় অসম্পূর্ণ ও ভাসাভাসা, নয় অন্যান্য অনুভূতির ফলাফলের সঙ্গে তাকে এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছে যা অসঙ্গত — একে আমরা বলি যুক্তির ত্রুটি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিকমতো পরিশীলিত ও ব্যবহৃত করতে, এবং সঠিকভাবে গৃহীত ও সঠিকভাবে ব্যবহৃত অনুভূতি দ্বারা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে যতক্ষণ আমরা সচেষ্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, আমাদের কর্মের ফলাফল থেকে অনুভূত বস্তুর কর্তা-নিরপেক্ষ (objective) প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির মিল প্রমাণিত হচ্ছে। এযাবৎ একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি যাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি দ্বারা আমাদের বহির্জগত সম্পর্কে যে ধারণা উপজিত হচ্ছে তা তৎপ্রকৃতিগতভাবেই বাস্তব থেকে বিভিন্ন, কিংবা বহির্জগত ও সে বিষয়ে আমাদে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে একটা অনিবার্য গরমিল বর্তমান।

কিন্তু তখন আসেন নয়া-ক্যান্টপন্থী অজ্ঞেয়বাদীরা এবং বলেন : হাঁ, একটা বস্তুর গুণাগুণ বোধ আমাদের সঠিক হতে পারে, কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়গত বা মনোগত প্রকরণেই প্রকৃত বস্তুটাকে (thing-in-itself) আমরা ধরতে পারি না। এই 'প্রকৃত-বস্তু' আমাদের জ্ঞান সীমার বাইরে। এবং উত্তরে হেগেল বহু পূর্বেই বলেছিলেন : একটা বস্তুর সমস্ত গুণই যদি জানা যায় তাহলে বস্তুটাকেও জানা হল ; বাকি যা রইল সেটা এই সত্য ছাড়া কিছুই নয় যে, বস্তুটা আমাদের বাদ দিয়েই বর্তমান ; এবং ইন্দ্রিয় মারফত এই সত্যটি শেখা হলেই প্রকৃত-বস্তুটির, ক্যান্টের বিখ্যাত অজ্ঞেয় Ding an sich-এর চূড়ান্ত অবশেষটিও জানা হয়ে যায়। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে যে, ক্যান্টের কালে প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ছিল এতই টুকরো টুকরো যে, প্রত্যেকটা বস্তুর যেটুকু আমরা জানতাম তার পরেও একটা রহস্যময় 'প্রকৃত-বস্তুর' সন্দেহ তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু একের পর এক এই সব অধরা বস্তুগুলোকে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং আরো বড়ো কথা, পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে বিজ্ঞানের অতিকায় প্রগতির কল্যাণে ; আর যেটাকে আমরা সৃষ্টি করতে পারি সেটাকে নিশ্চয় অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা যায় না। এ শতকের প্রথমার্ধে জৈববস্তুগুলি ছিল রসায়নের কাছে এই ধরনের রহস্য-বস্তু ; এখন জৈব ক্রিয়া ব্যতিরেকেই রাসায়নিক মৌলিক উপাদান থেকে একের পর এক তাদের বানাতে আমরা শিখেছি। আধুনিক রসায়নবিদরা ঘোষণা করেন, যে-বস্তুই হোক না কেন তার রাসায়নিক সংবিন্যাস জানতে পারলেই মৌলিক উপদান থেকে তাকে তৈরি করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের জৈববস্তুর, এ্যালবুমিন-বস্তুর সংবিন্যাস এখনো আমরা জানতে পারিনি ; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরেও তার জ্ঞান অর্জিত হবে না এবং তার সাহায্যে কৃত্রিম এ্যালবুমিন তৈরি করতে পারব না, এর কোন যুক্তি নেই। যদি তা পারি, তাহলে সেই সঙ্গে জৈব জীবনও আমরা সৃষ্টি করতে পারব, কেননা এ্যালবুমিন-বস্তুর অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধরন হল জীবন — তার নিম্নতম থেকে উচ্চতম রূপ পর্যন্ত।

এই সব আনুষ্ঠানিক মানসিক আপত্তি পেশ করার পরেই কিন্তু আমাদের অজ্ঞেয়বাদীর কথা ও কাজ একেবারে এক ঝানু বস্তুবাদীর মতো, যা তাঁর আসল স্বরূপ। অজ্ঞেয়বাদী হয়ত বলবেন, আমরা যতটা জেনেছি তাতে পদার্থ ও গতিকে, অথবা বর্তমানে তার যা নাম, তেজকে (energy) সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে যে তার সৃষ্টি হয়নি এমন প্রমাণ আমাদের নেই। কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর এই স্বীকৃতি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গেলেই তিনি মামলা খারিজ করে দেবেন। In abstracto (বিমূর্ত ক্ষেত্রে) অধ্যাত্মবাদ মানলেও in concreto (প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে) তা তিনি মোটেই মানতে রাজী নন। বলবেন, যতদূর আমরা জানি ও জানতে পারি তাতে বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নেই ; আমাদের সঙ্গে যতটা সম্পর্ক তাতে পদার্থ বা তেজ সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না ; আমাদের ক্ষেত্রে ভাবনা হল তেজের একটা ধরন, মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া ; যা কিছু আমরা জানি তা এই যে, বাস্তব জগত অমোঘ নিয়ম দ্বারা শাসিত, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক মানুষ, যে ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু জানেন, সে ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদী ; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানের বাইরে যে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, সে অজ্ঞতাকে তিনি গ্রীকে অনুবাদ করে বলেন agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।

যাই হোক, একটা জিনিস মনে হয় পরিষ্কার : আমি যদি অজ্ঞেয়বাদী হতাম তাহলেও এই ছোট বইখানিতে ইতিহাসের যে ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাকে 'ঐতিহাসিক অজ্ঞেয়বাদ' বলে বর্ণনা করা যে যেত না তা স্পষ্ট। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হাসাহাসি করতেন, অজ্ঞেয়বাদীরা সরোষে প্রশ্ন করতেন, আমি কি তাদের নিয়ে তামাসা শুরু করেছি ? তাই আশা করি বৃটিশ শালীনতাবোধও অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হবে না যদি ইংরাজি তথা অপরাপর বহু ভাষায় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারার এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা-শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের তজ্জনিত বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে।

এ প্রশ্রয় বোধ হয় আরো পাওয়া সম্ভব যদি দেখান যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৃটিশ শালীনতার পক্ষেও সুবিধাজনক হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ইংলন্ডে বসবাস করতে গিয়ে বিদগ্ধ বিদেশীদের যেটা চোখে পড়ত সেটাকে তাঁরা ইংরেজ শালীন মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি আর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য হতেন। আমি এবার প্রমাণ করতে চাই যে, বিদগ্ধ বিদেশীর কাছে সে সময় শালীন ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ঠিক যতটা নির্বোধ বলে মনে হত ততটা নির্বোধ তারা ছিল না। তাদের ধর্মীয় প্রবণতার ব্যাখ্যা আছে।

ইউরোপ যখন মধ্য যুগ থেকে উত্থিত হয় তখন শহরের উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ছিল তার বিপ্লবী অংশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত সংগঠনের মধ্যে তারা একটা সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও তার বর্ধমান ক্ষমতার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে ; মধ্য শ্রেণীর, bourgeoisie-র বিকাশের সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার সংরক্ষণ খাপ খাচ্ছিল না ; সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার পতন হতে হল।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরাট আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আভ্যন্তরীণ যুদ্ধাদি সত্ত্বেও তা সমগ্র সামন্ততান্তিক প্রতীচ্য ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিরাট রাজনৈতিক ভ্যবস্থায় এবং তা ছিল যেমন স্খিস্মাটিক গ্রীক দেশগুলির বিরুদ্ধে তেমনি মুসলিম দেশগুলির বিরুধে। সামন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ চার্চ স্বগীয় আশীর্বাণীর জ্যোতিঃভূষিত কর। সামন্ত কায়দায় এ চার্চ নিজ যাজকতন্ত্রের সংগঠন করে এবং শেষত, এ চার্চ নিজেই ইছল এক প্রবলতম সামন্ত অধিপতি, ক্যাথলিক জগতের পুরো একতৃতীয়াংশ জমি ছিল এর দখলে। দেশে দেশে এবং সবিস্তারে অপবিত্র সামন্ততন্ত্রকে সফলভাবে আক্রমণ করার আগে তার এই পবিত্র কেন্দ্রীয় সংগটনটিকে বিনষ্ট করার দরকার ছিল।

তাছাড়া মধ্য শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সমান্তরালে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিপুল পুনরুজ্জীবন ; জ্যোতির্বিঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তের চর্চা ফের শুরু হয়। শিল্পোৎপাদনে বিকাশের জন্য বর্জোয়ার দরকার ছিল একটা বিজ্ঞানের যাতে প্রাকৃতিক বস্তুর দৈহিক গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপিত করা যায়। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান হয়ে ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসী, খ্রীষ্ট বিশ্বাসের আরোপিত সীমা তাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হত না, সেই কারণে তা আদৌ বিজ্ঞানই চিল না। বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে ; বিজ্ঞান ছাড়া বুর্জোয়ার চলছিল না, তাই সে বিদ্রোহে যোগ দিতে হল তাকে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে উদীয়মান মধ্য শেণী যে কারণে সংঘাতে আসতে বাধ্য তার শুধু দুটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করলেও এটা দেখানোর পক্ষে তা যথেষ্ট যে, প্রথমত, রোমান চার্চের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর ; এবং দ্বিতীয়ত, সে সময় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামকেই নিতে হত ধর্মীয় ছদ্মবেশ, পরিচালিত করতে হত সর্বাগ্রে চার্চের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিধ্যালয় শহরের বযবসায়ীরা কলরবের সূত্রপাত করলেও প্রবল সাড়া পাওয়া নিশ্চিত ছিল এবং পাওয়া যা ব্যাপক গ্রামবসাসীদের মধেয, চাষীদের মধ্যে — আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে যাদের সর্বত্র সংগ্রাম করতে হত নিতন্ত প্রাণধারণের জন্যেই।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি হয় তিনটি চূড়ান্ত মহাযুদ্ধে।

প্রথমটিকে বলা হয় জার্মানির প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে রণধ্বনি তোলে তাতে সাড়া দেয় দুটি রাজনৈতিক চরিত্রের অভ্যুত্থান : প্রথমে ফ্রানৎস ফন জিকিঙ্গেনের নেতৃত্বে নিম্ন অভিজাতদের অভ্যুত্থান (১৫২৩), পরে — ১৫২৫ সালে — মহান কৃষকযুদ্ধ। দুটিই পরজত হয় প্রধানত যে-দলগুলির সবচেয়ে বেশি স্বার্থ, শহরের সেই বার্গারদের অনিশ্চিতমতির ফলে, এ অনিশ্চিতমতির কারণ নিয়ে এখানে আলোচনা চলে না। সেই সময় থেকে স্থানীয় রাজন্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির লড়াইয়েতে সে সংগ্রামের অধঃপতন ঘটে এবং তা পরিণতি হয় ইউরোপের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় জাতিগুলির ভেতর থেকে দুশ' বছরের জন্য জর্মানিকে মুছে দেওয়া। লুথারীয় রিফর্মেশন থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন ধর্মমত, স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রেরই উপযোগী একটা ধর্ম। উত্তর-পূর্ব জার্মানির কৃষকেরা লুথারবাদ গ্রহণ করতে না করতেই স্বাধীন লোক থেকে তারা পরিণত হল ভূমিদাসে।

কিন্তু লুথার যেখানে পরাজিত হলেন সেখানে জয়ী হলেন কালভাঁ। কালভাঁ-এর ধর্মমত ছিল তাঁর কালের সবচেয়ে সাহসী বুর্জোয়াদের উপযোগী। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক জগতে সাফল্য অসাফল্য মানুষের কর্ম বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর কর না, নির্ভর করে তার সাধ্যাতীত পরিস্থিতির ওপর, এই ঘটনাটার এক ধর্মীয় প্রকাশ হল তাঁর ঐশ্বরিক নির্বন্ধ (predestination) মতবাদ। অভিপ্রায়। সেটা আমার নয়, কম সেটা আমার নয়, উচ্চতর অজানা অর্থনৈতিক শক্তির কৃপায় ; এটা সবিশেষ সত্য ছিল অর্থনৈতিক বিপ্লবের সেই এক যুগে যখন সমস্ত পুরনো বাণিজ্য পথ ও কেন্দ্রের জায়গায় আসছে নতুন পত, নতুন কেন্দ্র, যখন ভারত ও আমেরিকা উন্মুক্ত হয়েচে দুনিয়ার কাছে, এবং যখন বিশ্বাসের পবিত্রতম অর্থনৈতিক মানদণ্ড যথা সোনা রুপোর দামও টলতে শুরু করেছে, ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কালভাঁ-এর গির্জা-গঠনতন্ত্র পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক। এবং ঈশ্বরের রাজত্ব যেখানে প্রজাতান্ত্রিক করে দেওয়া হয়েছে সেখানে ইহজগতের রাজত্ব কি থাকতে পারে রাজরাজড়া বিশপ আর সমান্তপ্রভুর অধীনে ? জার্মান লুথারবাদ যে ক্ষেত্রে রাজন্যদের হাতের পাঁচ হয়ে রইল সে ক্ষেত্রে কালভাঁবাদ হল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা করল একটি প্রজাতন্ত্রের এবং ইংলন্ডে সর্বোপরি স্কটল্যান্ডে সৃষ্টি করল সক্রিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টির।

কালভাঁবাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহান বুর্জোয়া অভ্যুত্থান পেল তার তৈরি মতবাদ। এ অভ্যুত্থান ঘটে ইংলন্ডে। শহরের মধ্য শ্রেণী (বুর্জোয়া) তাকে শুরু করে আর গ্রামাঞ্চলের চাষীরা (yeomanry) তা লড়ে শেষ করে। মজার ব্যাপার এই যে মহান তিনটি বুর্জোয়া অভ্যুত্থানেই লড়াইয়ের সৈন্যবাহিনী জোগায় কৃষকসম্প্রদায়, অথচ জয়লাভ হবার পরেই সে জয়লাভের অর্থনৈতিক ফলাফলে অতিনিশ্চিত যারা ধ্বংস হতে বাধ্য তারা হল এই কৃষকেরাই। ক্রমওয়েলের একশ' বছর পরে ইংলন্ডের কৃষককুল প্রায় অদৃশ্য হয়। মোটের ওপর কৃষককুল ও শহরের প্লেবিয়ান অংশ না থাকলে একা বুর্জোয়ারা কখনোই চরম পরিণতি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেত না এবং ফাঁসির মঞ্চে কখনোই এনে দাঁড় করাত না প্রথম চার্লসকে। বুর্জোয়ার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠা তখন অর্জনযোগ্য হয়ে উঠেছে শুধু সেইগুলো লাভ করতে হলেও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় বহুদূর পর্যন্ত — ঠিক ১৭৯৩ সালের ফ্রান্স এবং ১৮৪৮ সালের জার্মানির মতো। বস্তুত এ যেন বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবিকাশের একটা নিয়ম বলেই মনে হয়।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের এই আধিক্যের পর অবশ্যই আসে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং যে সীমা পর্যন্ত সে প্রতিক্রিয়ার থাকা সম্ভব ছিল তাও এবার তার ছাড়িয়ে যাবার পালা। একাদিক্রমে এদিক ওদিক দোলার পর অবশেষে পাওয়া যায় নতুন ভারকেন্দ্র এবং তা থেকে হয় একটা নতুন সূচনা। ইংলন্ডের ইতিহাসের যে সমারোহী যুগটা ভদ্রসম্প্রদায়ের কাছে 'বৃহৎ বিদ্রোহ' নামে পরিচিত সেই যুগ ও তার পরবর্তী সংগ্রামগুলির অবসান হয় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ এক ঘটনায়, উদারনৈতিক ঐতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব'*১৬।

নতুন সূচনাটি হল উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ও ভূতপূর্ব সামন্ত জমিদারদের মধ্যে আপোস। এখনকার মতোই এ জমিদারদের অভিজাত বলা হলেও বহু আগে থেকেই তারা সেই পথ নিয়েছিল যাতে তারা হয়ে ওঠে বহু পরবর্তী যুগের ফ্রান্সের লুই ফিলিপের মতো 'রাজ্যের প্রথম বুর্জোয়া'। ইংলন্ডের পক্ষে সৌভাগ্যবশত গোলাপের যুদ্ধের*১৭ সময় প্রাচীন সামন ব্যারনেরা পরস্পরকে ধিন করেছিল। তাদের উত্তরাধিকারীরা অধিকাংশই প্রাচীন বংশোদ্ভূত হলেও প্রত্যক্ষ বংশধারা থেকে এতই দূরে যে, তারা একটা নতুন সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, তাদের যা অভ্যাস ও মনোবৃত্তি সেটা সামন্ততান্ত্রিক নয়, হয়ে ওঠে বহু পরিমাণে বুর্জোয়া। টাকার দাম তারা বেশ বুঝত এবং অবিলম্বেই শত শত ক্ষুদে চাষীকে উচ্ছেদ করে সে জায়গায় ভেড়া রেখে তারা খাজনাবেশি তুলতে শুরু করে। অষ্টম হেনরি গির্জার জমি অপব্যয় করে পাইকারি হারে নতুন নতুন বুর্জোয়া জমিদার সৃষ্টি করেন ; অসংখ্য মহালের বাজেয়াপ্তি ও একেবারে ভুঁইফোড় বা আধা-ভুঁইফোড়দের নিকট তা ফের বিলি, গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে যা চলে তাতেও একই ফল হয়। সুতরাং, সপ্তম হেনরির সময় থেকে ইংরেজ 'অভিজাতরা' শিল্প উৎপাদনের বিকাশে বাধা দেবার বদলে উল্টে তাই থেকেই মুনাফা তোলার চেষ্টা করেছে ; এবং চিরকালই বড়ো বড়ো জমিদারদের এমন একটা অংশ ছিল যারা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে মহাজনী ও শিল্পজীবী বুর্জোয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক। ১৬৮৯ সালের আপোস তাই সহজেই

সাধিত হয়। 'অর্থ ও পদমর্যাদার' রাজনৈতিক বখরা রইল বড়ো বড়ো জমিদার বংশের জন্য এই সর্তে যে, মহাজনী কারখানাজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট দেখা হবে। এবং সে সময় দেশের সাধারণ নীতি নির্দেশ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এই সব অর্থনৈতিক স্বার্থ। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া হয়ত হত, কিন্তু মোটের ওপর অভিজাত গোষ্ঠীতন্ত্র খুব ভালোই জানত যে, তার নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নতি অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর উন্নতির সঙ্গে।

সেই সময় থেকে ইংলন্ডের শাসক শ্রেণীগুলির একটি বিনীত কিন্তু তথাপি স্বীকৃত অংশ হল বুর্জোয়ারা। অন্যান্য শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এদেরও সমান স্বার্থ ছিল দেশের বিপুল মেহনতীজনকে বশে রাখা। বণিক বা কারখানা-মালিক (manufacturer) নিজেই হল তার কেরাণী, তার মজুর, তার বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে প্রভু, বা কিছু আগে পর্যন্তও যা বলা হত 'স্বতঃই ঊর্ধ্বতন'। তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য বেশি ও যথাসাধ্য ভালো কাজ আদায় করাই তার স্বার্থ ; সে উদ্দেশ্যে ঠিকমতো বাধ্যতার শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে। নিজেও সে ধর্মভীরু ; তার ধর্মের পতাকা নিয়েই সে রাজা ও ভূস্বামীদের সঙ্গে লড়েছে ; স্বতঃই-অধস্তনদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে, ঈশ্বরস্থাপিত প্রভুটির আদেশাধীন করে তোলার দিক থেকে এ ধর্ম যে সুবিধা দান করছে তা আবিষ্কার করতে তার দেরি হয়নি। সংক্ষেপে 'ছোট লোকদের', দেশের বিপুল উৎপাদক জনগণকে দাবিয়ে রাখার কাজে ইংরেজ বুর্জোয়াকে এবার একটা অংশ নিতে হচ্ছে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যতম একটা উপায় হল ধর্মের প্রভাব।

আর একটা ঘটনাও ছিল যাতে বুর্জোয়াদের ধর্মীয় প্রবণতা বেড়েছে। সেটা হল ইংলন্ডে বস্তুবাদের উত্থান। এই নতুন মতবাদ মধ্য শ্রেণীর ধর্মানুভূতিতেই শুধু ঘা দেয়নি ; বুর্জোয়া সমেত বিপুল অশিক্ষিত জনগণের যাতে বেশ চলে যায় সেই ধর্মে বিপরীতে এ মতবাদ নিজেকে জাহির করল কেবল দর্শন বলে যা বিশ্বের পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনদেরই যোগ্য। হব্‌সের হাতে বস্তুবাদ মঞ্চে আসে রাজকীয় অধিকার ও ক্ষমতার সমর্থক হিসাবে। স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রকে তা আহ্বান করে সেই puer robustus sed malitiosus*১৮ অর্থাৎ জনগণকে দমন করতে। একই ভাবে হব্‌সের পরবর্তীদের — বলিংব্রক, শ্যাফ্‌ট্‌সবেরি ইত্যাদির কাছে বস্তুবাদের নতুন, deistic ধারাটা থেকে যায় একটা অভিজাত, অধিকার-ভেদী (esoteric) মতবাদ হিসাবে এবং সেই হেতু মধ্য শ্রেণীর কাছে তা ঘৃণ্য হয়, তার ধর্মীয় অস্বীকৃতি ও বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক যোগাযোগ উভয় কারণেই। এই ভাবে, অভিজাতদের deism ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মধ্য শ্রেণীর প্রধান শক্তি যোগাতে থাকল সেই সব প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়েরাই যারা রণপতাকা ও সংগ্রামী বাহিনী জুগিয়েছিল স্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে, 'মহান উদারনৈতিক পার্টির মেরুদণ্ড' আজো পর্যন্ত তারাই।

ইতিমধ্যে ইংলন্ড থেকে বস্তুবাদ চলে যায় ফ্রান্সে, সেখানে আর একটি বস্তুবাদী দার্শনিক ধারার, কার্থেজিয়ানবাদের*১৯ একটি শাখার সংস্পর্শে সে আসে ও তার সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও প্রথম দিকে বস্তুবাদ থাকে একটা একান্তভাবে অভিজাত মতবাদ হিসাবে। কিন্তু অচিরেই তার বিপ্লবী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করল। ফরাসী বস্তুবাদীরা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখল না ; তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা কিছু সামনে পড়ল সবেতেই প্রসারিত করল তাদের সমালোচনা ; তাদের মতবাদের সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতার দাবি প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ততম পন্থা অবলম্বন করে সাহসের সঙ্গে তা জ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল এক অতিকায় রচনা, Encyclopedie-য়, যা থেকে তাদের নাম। এই ভাবে খোলাখুলি বস্তুবাদ বা deism, এই দুই ধারার কোনো না কোনো একটা রূপে বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়াল ফ্রান্সের সমগ্র সংস্কৃতিবান যুবসমাজের মতবাদ ; এতটা পরিমাণে হল যে, মহান বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ইংরেজ রাজতন্ত্রীদের সৃষ্ট মতবাদটা থেকেই এল ফরাসী প্রজাতন্ত্রী ও সন্ত্রাসবাদীদের তাত্ত্বিক ধ্বজা, এবং 'মানবিক অধিকার ঘোষণাপত্রের'*১৯ বয়ান। মহান ফরাসী বিপ্লব হল বুর্জোয়াদের তৃতীয় অভ্যুত্থান, কিন্তু এই প্রথম বিপ্লব যা ধর্মের আলখাল্লাটা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে এবং লড়াই চালায় অনাবরণ রাজনৈতিক ধারায়। এদিক থেকেও এটা প্রথম যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের একপক্ষের, অর্থাৎ অভিজাতদের বিনাশ এবং অন্য পক্ষের, বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্যি করেই সে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়। ইংলন্ডে প্রাকবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর প্রতিষ্ঠানাদির ধারাবাহিকতা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার আপোসের প্রকাশ হয় আদালতী নজিরের ধারাবাহিকতায় এবং আইনের সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলির পবিত্র সংরক্ষণে। ফ্রান্সে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় বিপ্লব ; সামন্ততন্ত্রের শেষ জেরটুকুও তা সাফ করে Code Civil-এর মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিবাদী পরিস্থিতির উপযোগী করে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় প্রাচীন রোমক আইনকে — মার্কস যাকে বলেছিলেন পণ্যোৎপাদন, সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের অনুসারী আইনী সম্পর্কের একটি প্রায় নিখুঁত প্রকাশ ছিল তাতে, — এমন চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় যে, এই ফরাসী বিপ্লবী বিধি-সংহিতাটি আজো পর্যন্ত অন্য সব দেশের সম্পত্তি-আইন সংস্কারের আদর্শস্বরূপ, ইংলন্ডও বাদ নয়। অবশ্য, ইংরাজি আইন যদিও পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করেই চলেছে সেই বর্বর সামন্ততান্ত্রিক ভাষায় যার সঙ্গে প্রকাশিত বস্তুর ততটাই সাদৃশ্য যতটা সাদৃশ্য ইংরাজি বানানের সঙ্গে ইংরাজি উচ্চারণের — vous ecrivez Londres et vous prononcez Constantinople*২০ বলেছিলেন

জনৈক ফরাসী — তবু এ কথা ভোলা ঠিক নয় যে, সেই একই ইংরাজি আইনই একমাত্র আইন যা প্রাচীন জার্মান ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বশাসন এবং আদালত ছাড়া অন্য সমস্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির সেরা অংশটিকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে এবং প্রেরণ করেছে আমেরিকা ও উপনিবেশে — স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রের যুগে কন্টিনেন্ট থেকে এ জিনিসটা লোপ পায় এবং এখনো পর্যন্ত কোথাও তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়নি।

আমাদের বৃটিশ বুর্জোয়ার কথায় ফেরা যাক। ফরাসী বিপ্লবের ফলে তার একটা চমৎকার সুযোগ হল কন্টিনেন্টের রাজতন্ত্রগুলির সাহায্যে ফরাস নৌবাণিজ্য ধ্বংস, ফরাসী উপনিবেশ অধিকার এবং জলপথে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ দাবিটাকেও চূর্ণ করার। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে বৃটিশ বুর্জোয়া যে লড়েছিল তার একটা কারণ এই। আর একটা কারণ, এ বিপ্লবের ধরণ-ধারণটা তার অভিরুচিকে বড়ো বেশি ছাড়িয়ে যায় — 'জঘন্য' সন্ত্রাস শুধু নয়, বুর্জোয়া শাসনকে চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টাটাই। যে অভিজাতরা বৃটিশ বুর্জোয়াকে আদব-কায়দা শিখিয়ে তুলেছে (ঠিক নিজেরই মতো), ফ্যাশন উদ্ভাবন করে দিয়েছে তার জন্য, যারা অফিসার জুগিয়েছে সেই সৈন্যবাহিনীতে, যা শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে স্বদেশে, এবং সেই নৌবাহিনীতে, যা জয় করে দিয়েছে ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং বিদেশের নতুন নতুন বাজার — তাদের বাদ দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়ার চলে কী করে? বুর্জোয়াদের একটা প্রগতিশীল সংখ্যালঘু অবশ্য ছিল, আপোসের ফলে এ সংখ্যালঘুর স্বার্থ তত বেশি দেখা হচ্ছিল না। অপেক্ষাকৃত কম সম্পন্ন মধ্য শ্রেণী দিয়ে প্রধানত তৈরি এই অংশটার সহানুভূতি ছিল বিপ্লবের প্রতি, কিন্তু পার্লামেন্টে তার ক্ষমতা ছিল না।

এ ভাবে বস্তুবাদ যতই হয়ে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ ততই ধর্মভীরু ইংরেজ বুর্জোয়া আরো বেশি আঁকড়ে ধরে ধর্ম। জনগণের ধর্মচেতনা লোপ পেলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা কি প্যারিস সন্ত্রাসের কালে প্রমাণ হয়নি? বস্তুবাদ যতই ফ্রান্স থেকে আশেপাশের দেশে ছড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল অনুরূপ মতধারা থেকে, বিশেষ করে জার্মান দর্শন থেকে, সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তা ও বস্তুবাদ যতই কন্টিনেন্টে বস্তুতপক্ষে বিদগ্ধ ব্যক্তি অনিবার্য গুণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, ততই গোঁ ধরে ইংরেজ মধ্য শ্রেণী আঁকড়ে রইল তার বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসকে। এ সব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক তফাৎ যতই থাকুক তাদের সবকটিই হল পরিষ্কার রকমের ধর্মীয়, খৃষ্টীয় বিশ্বাস।

বিপ্লব যখন ফ্রান্সে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত করছিল, সেই সময় ইংলন্ডে ওয়াট, আর্করাইট, প্রভৃতিরা সূচিত করে এক শিল্প বিপ্লবের, অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারকেন্দ্র তাতে পুরোপুরি সরে যায়। ভূমিজীবী অভিজাতদের চেয়ে বুর্জোয়ার সম্পদ বেড়ে উঠতে লাগল অতি দ্রুততগতিতে। খাস বুর্জোয়ার মধ্যেই মহাজনী অভিজাত, বাঙ্কার প্রভৃতিদের ক্রমেই পেছনে ঠেলে এগিয়ে এল কারখানা-মালিকেরা। ১৬৮৯ সালের আপোস এযাবৎ ক্রমশ বুর্জোয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে এলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পারস্পরিক অবস্থানের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছিল না। পক্ষগুলির চরিত্রেও বদল হয়েছে; ১৮৩০ সালের বুর্জোয়ারা আগের শতকের বুর্জোয়ার চেয়ে ভয়ানক পৃথক। অভিজাতদের হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে গিয়েছিল এবং নতুন শিল্পজীবী বুর্জোয়ার দাবি-দাওয়া প্রতিরোধে যা ব্যবহৃত হচ্ছিল তা নতুন অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাতদের সঙ্গে একটা নতুন লড়াইয়ের প্রয়োজন পড়ল; তার পরিণতি হতে পারত কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক শক্তির জয়লাভে। প্রথমে, ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে, সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও সংস্কার আইন (Reform Act)*২২ পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। এতে পার্লামেন্টে বুর্জোয়ারা পেল একটা শক্তিশালী ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা। তারপর শস্য আইন বরবাদ*২৩, এতে ভূমিজীবী অভিজাতদের ওপর বুর্জোয়ার, বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ — কারখানা-মালিকদের প্রাধান্য চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়ার এই সবচেয়ে বড়ো জয়; একান্ত নিজের স্বার্থে অর্জিত বিজয় হিসাবে এই আবার কিন্তু তার শেষ বিজয়। পরে যা কিছু সে জিতেছে তা ভাগ করে নিতে হয়েছে নতুন একটা সামাজিক শক্তির সঙ্গে, এ শক্তি ছিল প্রথমে তার সহায় কিন্তু অচিরেই হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্প বিপ্লবে বৃহৎ কারখানা-মালিক পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চেয়ে বহু বেশি সংখ্যায় কলজীবী শ্রমিকদের একটা শ্রেণী। যে অনুপাতে শিল্প বিপ্লব উৎপাদনের একটা শাখার পর আর একটা শাখা অধিকার করতে থাকে সেই অনুপাতে এ শ্রেণী ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী। ১৮২৪ সালেই এ শক্তির প্রমাণ সে দেয় — শ্রমিকদের সমিতি গঠনের নিষেধ-আইন নাকচ করতে অনিচ্ছুক পার্লামেন্টকে বাধ্য করে। সংস্কার আন্দোলনের সময় শ্রমিকেরা ছিল সংস্কার দলে (Reform paty) র‍্যাডিক্যাল অংশ; ১৮৩২ সালের আইনে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তারা জনগণের চার্টার বা সনদে নিজেদের দাবি-দাওয়া নির্দিষ্ট করে শস্য আইন-বিরোধী বৃহৎ বুর্জোয়া পার্টির বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত করে এক স্বাধীন চার্টিস্ট*২৪ পার্টিতে, আধুনিক কালে এই প্রথম মজুর পার্টি।

তারপর শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে কন্টিনেন্টের বিপ্লবগুলি। এতে শ্রমিকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয় এবং, অন্তত প্যারিসে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করে পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

তা নিশ্চিতই অননুমোদনীয়। তারপর সাধারণ প্রতিক্রিয়া। প্রথমে, ১৮৪৮ সালের ১০ই এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয়, তারপর সেই বছরেই জুনে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালী, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ জার্মানিতে ১৮৪৯ সালের বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর প্যারিসের ওপর লুই বোনাপার্টের জয়।*২৫ অন্ততঃ কিছু কালের জন্য শ্রমিক দাবি-দাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল, কিন্তু কী মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি বৃটিশ বুর্জোয়ারা আগেই বুঝে থাকে তবে এত সব অভিজ্ঞতার পর সে প্রয়োজনীয়তা তারা আরো কতো বেশিই না টের পাচ্ছে! কন্টিনেন্টী ভায়াদের বিদ্রূপের পরোয়া না করে তারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে চলেছে; নিজেদের স্বদেশী ধর্মযন্ত্রে তুষ্ট না হয়ে তারা আবেদন জানিয়েছে ধর্ম ব্যবসার বৃহত্তম সংগঠক জোনাথান ভাইয়ের*২৬ কাছে এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে রিভাইভ্যালিজ্‌ম্‌*২৭, মুডি স্যাঙ্কি প্রভৃতিদের; এবং পরিশেষে 'স্যালভেশন আর্মির' বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করেছে — এরা আদি খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ফিরিয়ে আনছে, সেরা অংশ হিসেবে আবেদন করে গরিবদের কাছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়ে ধর্মের মধ্যে দিয়ে এবং এই ভাবে আদি খৃষ্টীয় শ্রেণী বৈরিতার একটা বীজ লালন করে তুলছে, যে সম্পন্ন লোকেরা আজ এর জন্য নগদ টাকা ধরে দিচ্ছে তাদের কাছে যা হয়ত একদিন মুশ্‌কিল বাধাবে।

মনে হয় এ যেন ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নিয়ম যে, মধ্য যুগে সামন্ত অভিজাতরা যে-ভাবে একান্তরূপে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, কোনো ইউরোপীয় দেশেই বুর্জোয়ারা সে-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখতে পারবে না — অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্য। এমনকি সামন্ততন্ত্র যেখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই ফ্রান্সেও বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের পুরো দখল পেয়েছে কেবল অতি স্বল্প কতকগুলি সময়ের জন্য। ১৮৩০ — ১৮৪৮ সালে লুই ফিলিপের রাজত্বকালে বুর্জোয়াদের একটা ক্ষুদ্র অংশই রাজ্য চালায়; যোগ্যতার কড়া সর্তের ফলে তাদের বড়ো অংশটাই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে, ১৮৪৮ — ১৮৫১ সালের মধ্যে, সমগ্র বুর্জোয়াই শাসন চালায়, কিন্তু কেবল তিন বছরের জন্য; তাদের অক্ষমতায় এল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য। মাত্র এখন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রেই বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের কর্ণধার হয়ে আছে কুড়ি বছরেরও বেশি কাল, এবং ইতিমধ্যেই তাদের অবক্ষয়ের শুভলক্ষণ ফুটে উঠছে। বুর্জোয়াদের একটা স্থায়ী শাসন সম্ভব হয়েছে কেবল আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে সামন্ততন্‌র অজানা এবং সমাজ প্রথম থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া ভিত্তিতে। এবং এমনকি ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও বুর্জোয়ার উত্তরাধিকারী শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে।

ইংলন্ডে বুর্জোয়াদের কখনোই একক অধিকার ছিল না। ১৮৩২ সালের বিজয়েও ভূমিজীবী অভিজাতদের হাতে প্রধান প্রধান সরকারী পদের প্রায় পূর্ণ দখল ছিল। ধনী মধ্য শ্রেণী যে-রূপ বিনয়ে এটা মেনে নেয় তা আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন না উদারনীতিক বৃহৎ কলওয়ালা মিঃ ডবলিউ এ. ফর্স্টার প্রকাশ্য ভাষণে ব্র্যাডফোর্ডের যুবসম্প্রদায়কে জানান, দুনিয়ায় চলতে হলে ফরাসী শিখতে হবে, এবং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে তাঁকে যখন এমন একটা মহলে চলাফেরা করতে হত যেখানে ফরাসী ভাষা অন্তত ইংরাজি ভাষার মতোই জরুরী তখন তাঁকে কী আহাম্মকই না লাগত। আসলে তখনকার ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ছিল সাধারণত একেবারে অশিক্ষিত ভুঁইফোঁড়, অভিজাতদের তারা উচ্চতর সেই সব সরকারী পদ না দিয়ে পারত না যেখানে ব্যবসায়ী চতুরতায় পোক্ত একটা নিতান্ত গন্ডি সঙ্কীর্ণতা ও গন্ডি অহমিকা ছাড়াও অন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল।*২৮ এমনকি এখনো মধ্য শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে সংবাদপতেরর অনবসান বিতর্ক থেকে দেখা যায়, ইংরেজ মধ্য শ্রেণী এখনো নিজেকে সেরা শিক্ষার যোগ্য বলে মনে করে না, কিছু কম-সমের দিকেই তার চোখ। সুতরাং শস্য আইন বাতিল করার পরেও এ যেন স্বাভাবিক যে, কবডেন, ব্রাইট, ফর্স্টার প্রভৃতি যে লোকরো জিতল তারা দেশের সরকারী শাসনের অংশ থেকে বঞ্চিত রইল পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত যতদিন না নতুন একটা সংস্কার আইনে ক্যাবিনেটের দ্বার উন্মুক্ত হয় তাদের জন্য। ইংরেজ বুর্জোয়ারা আজো পর্যন্ত তাদের সামাজিক হীনতাবোধে এত বেশি আচ্ছন্ন যে, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তারা যোগ্যরূপে জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বীয় খরচায় এবং জাতির খরচায় এক দল শোভাবর্ধক নিষ্কর্মার প্রতিপালন করে চলেছে; এবং নিজেদের দ্বারাই তৈরি করা এই অধিকারী ও সুবিধাভোগী মহলে নিজেদের কেউ যখন প্রবেশাধিকারের যোগ্য বিবেচিত হয় তখন ভয়ানক সম্মানিত বোধ করে তারা।

সুতরাং শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে ভূমিজীবী অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে না করতে মঞ্চে আবির্ভাব হল আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রমিক শ্রেণীর। চার্টিস্ট আন্দোলন ও কন্টিনেন্টের বিপ্লবগুলির পরেকার প্রতিক্রিয়া তথা ১৮৪৮-১৮৬৬ সালের বৃটিশ বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে (স্থূলভাবে বলা হয় একমাত্র স্বাধীন বাণিজ্যই তার কারণ, তার চেয়েও কিন্তু অনেক বড়ো কারণ রেলপথ মুদ্র জাহাজ ও সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিস্তার) শ্রমিক শ্রেণীকে ফের উদারনীতিক দলের অধীনে যেতে হয় — প্রাক চার্টিস্ট যুগের মতো তারা হয় এ দলের র‍্যাডিক্যাল অংশ। তাদের ভোটাধিকারের দাবি কিন্তু ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে; উদারনীতিকদের

হুইগ নেতারা যে-ক্ষেত্রে 'ভয় পায়' সে-ক্ষেত্রে ডিজরেলি তাঁর উৎকর্ষের প্রমাণ দিয়ে টোরিদের পক্ষে অনুকূল মুহূর্তটিকে ব্যবহার করে আসনের পুনর্বন্টন সহ প্রবর্তন করান 'বরো'-গুলিতে ঘর-পিছু ভোট (household suffrage in the boroughs)। অতঃপর প্রবর্তিত হয় ব্যালট ; তারপর ১৮৮৪ সালে কাউন্টিগুলিতেও ঘর-পিছু ভোটাধিকারের প্রসার এবং আসনের আর একটা নববন্টন যাতে নির্বাচনী এলাকাগুলি কিছুটা সমান সমান হয়ে আসে। এই সব ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচনী ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে, অন্তত দেড় শ' থেকে দুই শ'টি নির্বাচনী এলাকায় এ শ্রেণীর লোকেরাই এবার হয় অধিকাংশ ভোটদাতা। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান শেখানর একটা খাসা ইস্কুল হলপার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ; লর্ড জন ম্যানের্স ঠাট্টা করে যাদের বলেছিলেন 'আমাদের সাবেকি অভিজাত' তাদের দিকে মধ্য শ্রেণী যদি তাকায় সভয়সম্ভ্রমে তাহলে শ্রমিক শ্রেণীও শ্রদ্ধা সম্মান করে তাকাবে মধ্য শ্রেণীর দকে যাদের অভিহিত করা হয়েছে তাদের 'শ্রেয়তর' বলে। বস্তুতপক্ষে, বছর পনের আগে বৃটিশ মজুর ছিল আদর্শ মজুর, মনিবের প্রতিষ্ঠার প্রতি তার সশ্রদ্ধ সম্মান এবং নিজের জন্য অধিকার দাবি করতে তার সংযমী বিনয় দেখে আমাদের ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্ট*২৯ গোষ্ঠীর জার্মান অর্থনীতিবিদরা তাদের স্বদেশী মজুরদের দুরারোগ্য কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী প্রবণতায় একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ভালো ব্যবসায়ী বলে জার্মান অধ্যাপকদের চেয়ে দূরদর্শী। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তারা ক্ষমতা ভাগ করে যে নিয়েছিল তা অনিচ্ছা সহকারে। চার্টিস্ট আন্দোলনের বছরগুলিতে তারা শিখেছে সেই puer robustus sed malitiosus, অর্থাৎ জনগণের ক্ষমতা কেমন। সেই সময় থেকে জনগণের চার্টারের সেরা ভাগটা তারা যুক্তরাজ্যের স্ট্যাটিউটে সন্নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এখনই সবচেয়ে বেশি করে জনগণকে শৃঙ্খলায় রাখতে হবে নৈতিক উপায়ে, এবং জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের কার্যকরী সমস্ত নৈতিক উপায়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল এবং রয়েই গেল ধর্ম। এই কারণেই স্কুল বোর্ডগুলিতে পাদ্রীদের সংখ্যাধিক্য, এই কারণেই পূজার্চনা থেকে 'স্যালভেশন আর্মি' পর্যন্ত সর্ববিধ পুনরুদয়বাদের (revivalism) সমর্থনে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আত্ম-ট্যাক্স।

কন্টিনেন্টী বুর্জোয়ার স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মীয় শিথিলতার ওপর এবার জিত হল বৃটিশ শালীনতার। ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে তারা একেবারে সংক্রামিত এবং যে উপায়ে স্বীয় প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, তার বৈধতা নিয়ে তারা, সঠিক কারণেই, বিশেষ ভাবিত নয়। এখানকার puer robustus দিন দিন বেশি malitiosus হয়ে উঠছে। বড়াই করে জ্বলন্ত চুরুটটা নিয়ে ডেকের ওপর আসার পর সমুদ্রপীড়ার প্রকোপে ছোকরা যাত্রী যেমন সেটিকে গেপেনে ত্যাগ করে তেমনি ভাবে শেষ পন্থা হিসাবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তা নিঃশব্দে পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না ; বাইরের ব্যবহারে একের পর এক ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল ঈশ্বরবিদ্বেষীরা, চার্চ এবং তার শাস্ত্রবচন ও অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে কথা কইতে লাগল সম্মান করে, যেটুকু না করলে নয় সে সব মেনেও নিতে লাগল। ফরাসী বুর্জোয়ারা শুক্রবার শুক্রবার হবিষ্যি শুরু করল আর রবিবার রবিবার জার্মান বুর্জোয়ারা গির্জায় নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে শুনতে লাগল দীর্ঘ প্রটেস্টান্ট সার্মন। বস্তুবাদ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে। "Die Religion muss dem Volk erhalten werden" — ধর্মকে জীইয়ে রাখতে হবে জনগণের জন্য — সমূহ সর্বনাশ থেকে সমাজের পরিত্রাণের এই হল একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়। দুর্ভাগ্যবশত, চিরকালের মতো ধর্মকে চূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য করার আগে এটি তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। এবার বিদ্রূপ করে বৃটিশ বুর্জোয়ার বলার পালা : 'আহাম্মকের দল, এ কথা তো দুশ বছর আগেই আমি তোমাদের বলতে পারতাম!'

আমার কিন্তু আশঙ্কা, বৃটিশদের ধর্মীয় নিরেটত্ব অথবা কন্টিনেন্টী বুর্জোয়াদের post festum*৩০ দীক্ষাগ্রহণ কিছুতেই বর্ধমান প্রলেতারীয় তরঙ্গকে ঠেকাতে পারবে না। ঐতিহ্যের একটা মস্ত পিছু-টানের শক্তি আছে, ইতিহাসের যে vis inertiae*৩১, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ক্রিয় বলে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজের চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ ধর্ম হবে না। আমাদের আইনী, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলি যদি হয় একটা নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কপাতের মোটামুটি সুদূর কতকগুলো শাখা তাহলে এই সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সহ্য করে এ সব শাখা টিকে থাকতে পারবে না। এবং অলৌকিক দৈব-প্রজ্ঞায় বিশ্বাস না করলে আমাদের মানতেই হবে যে, পতনোন্মুখ সমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখার শক্তি কোনো ধর্মীয় প্রবচনের নেই।

বস্তুতপক্ষে ইংলন্ডেও শ্রমিক শ্রেণী ফের সচল হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, তারা নানাবিধ ঐতিহ্যে শৃঙ্খলিত। বুর্জোয়া ঐতিহ্য, যথা এই ব্যাপক-প্রচলিত বিশ্বাস যে, শুধু রক্ষণশীল ও উদারনীতিক, মাতর এই দুটি পার্টিই থাকা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি অর্জন করতে হবে মহান উদারনীতিক পার্টির সাহায্যে ও তারই মাধ্যমে। শ্রমিকদের ঐতিহ্য, যা স্বাধীন সংগ্রামের প্রথম খসড়া প্রচেষ্টা থেকে তারা পেয়েছে, যথা যারা একটা নিয়মিত শিক্ষানবিসীর মধ্য দিয়ে আসেনি এমন সমস্ত আবেদনকারীকে সাবেকি বহু ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বাদ দিয়ে রাখা ; তার অর্থ দাঁড়াবে এই সব ইউনিয়ন কর্তৃক নিজেদের হাতেই নিজেদের বেইমান বাহিনী গঠন করা। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ইংরেজ শ্রমিক

শ্রেণী এগুচ্ছে, ভ্রাতৃপ্রতিম ক্যাথিডার-সোশ্যালিসটদের কাছে এমনকি অধ্যাপক ব্রেনতানোকেও যা রিপোর্ট করতে হয়েছে সখেদে। এগুচ্ছে, ইংলন্ডের সবকিছুর মতোই, ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে, কোথাও দ্বিধা, কোথাও মেটের ওপর অসফল অনিশ্চিত প্রচেষ্টায়; এগুচ্ছে মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্র এই নামটার প্রতি এক অতিসতর্ক অবিশ্বাস নিয়ে, সেই সঙ্গে ক্রমশই তার সারবস্তুটিকে আত্মসাৎ করছে সে; এবং এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের একটার পর একটা স্তরকে ধরে ফেলছে। লন্ডন ইস্ট এন্ডের অনিপুণ মজুরদের তন্দ্রা ঘুচিয়ে দিয়েছে এ আন্দোলন, এবং আমরা সকলেই জানি, প্রতিদানে এই নতুন শক্তিগুলি কী চমৎকার প্রেরণা জুগিয়েছে শ্রমিক শ্রেণীতে। আন্দোলনের গতি যদি কারো অধৈর্যের সমপর্যায়ে না উঠে থাকে তাহলে এ কথা যেন তাঁরা না ভোলেন যে, ইংরেজ চরিত্রের সেরা গুণগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিকেরাই এবং একটা অগ্রসর পদক্ষেপ যদি ইংলন্ডে একবার অর্জিত হয় তাহলে পরে তা প্রায় কখনো মোছে না। সাবেকি চার্টিস্টদের ছেলেরা যদি পূর্বকথিত কারণে ঠিক বাপকা বেটা হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তবে নাতিদের দেখে মনে হয় পূর্বপুরুষদের মান তারা রাখবে।

কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলন্ডের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলন্ড ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগে। শেষোক্ত দুটি দেশেই শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ডের চেয়ে বেশ এগিয়ে। জার্মানিতে এমনকি তার সাফল্যের দিন এখন হিসবের মধ্যেও ধরা যায়। গত পঁচিশ বছরে সেখানে তার যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা অতুলনীয়। ক্রমবর্ধমান গতিতে সে এগুচ্ছে। জার্মান মধ্য শ্রেণী যদি রাজনৈতিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সাহস, উদ্যোগ, অধ্যবসায়ে শোচনীয় অযোগ্যতা জাহির করে থাকে, তবে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই সবকটি যোগ্যতারই প্রভূত প্রমাণ দিয়েছে। চারশ' বছর আগে ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীর প্রথম উৎসারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি; অবস্থা এখন যা, তাতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চও হবে জার্মানি, এ কি সম্ভাব্যতার বাইরে?

২০শে এপ্রিল, ১৮৯২

ফ্র. এঙ্গেলস

এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের ইংরাজি সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত; এ বই লন্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে একই সঙ্গে ১৮৯২—১৮৯৩ সালের Neue Zeit পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়

ইংরাজিতে লিখিত। ১৮৯২ সালের ইংরেজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

১

একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনের মধ্যেকার নৈরাজ্য — মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। কিন্তু তত্ত্বগত আকারে আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রকাশ্য উদয় অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী দার্শনিকদের বর্ণিত নীতির অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ সম্প্রসারণরূপে। বাস্তব অর্থনৈতিক ঘটনার যতই গভীরে তার মূল নিহিত থাক না কেন, প্রতিটি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রকেও হাতে পাওয়া পূর্বপ্রস্তুত বুদ্ধিমার্গীয় মালমসলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল।

ফরাসী দেশে যে মহামানবেরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন তৈরি করে গেছেন তাঁরা নিজেরাও ছিলেন চরম বিপ্লবী। বাইরেকার কোনো প্রামাণিকতা তাঁরা স্বীকার করেননি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান — কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয় সবকিছুই; যুক্তির বিচারবেদীর সম্মুখে সবকিছুকেই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে নতুবা অন্তর্হিত হতে হবে। সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠি হয় যুক্তি। হেগেল বলেন, সে সময় বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার ওপর*৩২; প্রথমত এই অর্থে যে, মনুষ্য মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত ধারণাগুলিই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে নিজেদের দাবি করে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে-বাস্তবের সঙ্গে এই নীতি মিলত না সে বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দেওয়া হয়। তদানীন্তন সব ধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তাকুঁড়ে। বিশ্ব এযাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যা কিছু অতীত তা সবকিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য। এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, যুক্তির রাজদন্ড; এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার, বিযোধিকর, নিপীড়নের জায়গা নেবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার, স্বয়ং প্রকৃতির নিয়মজাত সাম্য এবং মানবের অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

এখন আমরা জানি, যুক্তির এই রাজত্বটা বুর্জোয়ার আদর্শায়িত রাজ্য ছাড়া বেশি কিছু নয়; জানি যে, এই শাশ্বত অধিকার রূপায়ণ লাভ করেছে বুর্জোয়া ন্যায়ে, সাম্য পণিত হয়েছে আইনের চোখে বুর্জোয়া সমানাধিকারে; বুর্জোয়া সম্পত্তি ঘোষিত হয়েছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে; এবং যুক্তির শাসন, রুসোর*৩৩ 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব হয়েছে এবং বাস্তব হওয়াই সম্ভব কেবল একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্র রূপে। অষ্টাশ শতকের মহামনীষীদের

পক্ষে তাদের পূর্বতনদের মতোই স্বীয় যুগের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বার্গাররা (বুর্জোয়া) অবশিষ্ট সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করছিল তাদের বৈরিতার পাশাপাশি ছিল শোষক ও শোষিত, নিষ্কর্মা ধনী ও গবির মজুরদের সাধারণ বৈরিতা। এই পরিস্থিতি ছিল বলেই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা শুধু একটা বিশেষ শ্রেণী নয়, সমগ্র নিপীড়িত মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয়। অপিচ। জন্ম থেকেই বুর্জোয়া তার বিপরীত (antithesis) দ্বারা ভারাক্রান্ত : মজুরি-খাটা শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব অসম্ভব, এবং ডিল্ডের মধ্যযুগীয় বার্গার যে পরিমাণে আধুনিক বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হয় সে পরিমাণেই গিল্ডের কর্মী (journeymen) এবং গিল্ডের বাইরেকার দিন-মজুরেরা পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে। এবং অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা যুগপৎ সে-কালের বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব মোটের ওপর দাবি করতে পারলেও বড়ো বড়ো প্রত্যেকটা বুর্জোয়া আন্দোলনেই স্বাধীন বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই শ্রেণীটির যারা বর্তমান প্রলেতারিয়েতের কমবেশি পরিণত পুরোধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মান রিফর্মেশন ও কৃষক যুদ্ধের কালে আনাব্যাপটিস্টরা*৩৪ ও টমাস ম্যুনৎসার, মহান ইংরেজ বিপ্লবে লেভেলাররা*৩৫, মহান ফরাসী বিপ্লবে বাব্যেফ।

তখনো অপরিণত একটা শ্রেণীর এই সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রতিসঙ্গী তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাও ছিল ; ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছবি*৩৬ ; অষ্টাদশ শতকে সত্যিকার কমিউনিস্ট-সুলভ তত্ত্ব (মরেলি ও মাব্লি)। সাম্যের দাবটা আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও। শুধু শ্রেণীগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদের কথা নয়, শ্রেণীভেদেরই অবসান। জীবনের সবকিছু উপভোগ বর্জন করে যোগীসুলভ একধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হল এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ। এর পর এলেন তিনজন মহান ইউটোপীয় : সাঁ-সিমোঁ, তাঁর কাছে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পাশাপাশি মধ্য শ্রেণীর আন্দোলনেরও একটা তাৎপর্য ছিল ; ফুরিয়ে এবং ওয়েন — ইনি সেই দেশের লোক যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে বিকশিত, তদুদ্ভূত বৈরিতার প্রভাবে ইনি ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রণয়ন করেন।

একটা ব্যাপার তিনেতেই সমান। ঐতিহাসিক বিকাশ ইতিমদ্যে যে প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি করেছে সেই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কেউ দেখা দেননি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি দিয়ে শুরু না করে ফরাসী দার্শনিকদেরমতো তাঁরা সমগ্র মানবেরই মুক্তি দাবি করেন। তাঁদের মতোই এঁদেরও অভিলাষ যুক্তি ও শাশ্বত ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপন, কিন্তু তাঁদের রাজত্ব ফরাসী দার্শনিকদের থেকে ততটা দূরে যতটা সুদূর মর্ত্য থেকে স্বর্গ।

কেননা আমাদের এই তিন সংস্কারকদের কাছে, ফরাসী দার্শনিকদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগতটাও সমান অযৌক্তিক ও অন্যায্য এবং সেই কারণে, সামন্ততন্ত্র তথা সমাজের পূর্বতন স্তরগুলির মতোই সত্বর আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপনীয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায় যদি এযাবৎ দুনিয়াকে শাসন না করে থাকে, তবে তা একমাত্র কারণ, মানুষ তা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। দরকার ছিল শুধু এক প্রতিভাধর ব্যক্তির — এবার তার অভ্যুদয় ঘটেছে, সত্য তার করায়ত্ত। এখন যে তার অভ্যুদয় ঘটল, সত্য যে এখনই পরিষ্কার করে বোঝা গেল, সেটা ঐতিহাসিক বিকাশের গ্রন্থি বেয়ে আসা এক অনির্বা ব্যাপার নয়, নিতান্তই এক শুভ দৈবঘটনা। পাঁচশ' বছর আগেও তার এ অভ্যুদয় ঘটতে পারত এবং সেক্ষেত্রে মানব সমাজকে পাঁচশ' বছরে ভ্রান্তি, সংঘর্ষ ও ক্লেশ ভুগতে হত না।

আমরা দেখেছি, বিপ্লবের পুরোগামী, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকেরা বিদ্যমান সবকিছুরই একমাত্র বিচারক বলে হাজির করে যুক্তিকে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটা যুক্তিসিদ্ধ সরকার, যুক্তিসিদ্ধ সমাজ ; শাশ্বত যুক্তির যা কিছু পরিপন্থী তা সবকিছুকেই নির্মমভাবে বিলোপ করতে হবে। এও দেখেছি যে, আসলে যে অষ্টাদশ শতকের বার্গার ঠিক সেই সময়টায় বুর্জোয়া হয়ে উঠছিল তারই আদর্শায়িত বোধ ছাড়া এ শাশ্বত যুক্তি আর কিছুই নয়। ফাসী বিপ্লবে এই যুক্তিসিদ্ধ সমাজ ও সরকার বাস্তব হয়।

কিন্তু নতুন ব্যবস্থা আগেকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ হলেও মোটেই পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠল না। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ পতন হল। রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব রূপ পেল 'সন্ত্রাসের শাসনে' (Reign of Terror)। নিজস্ব রাজনৈতিক সামর্থ্যে বুর্জোয়ারা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, তারা এ থেকে নিস্তার খুঁজল প্রথমে ডিরেক্টরেটের দুর্নীতিপরায়ণতায় এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের পক্ষপুটে।*৩৭ প্রতিশ্রুত শাশ্বত শান্তি পরিণত হল এক দিগ্বিজয়ের অবিরাম যুদ্ধে। যুক্তিভিত্তিক সমাজের হালও এ থেকে ভালো হল না। এক সাধারণ সম্পন্নতা সৃষ্টি হয়ে ধনী দরিদ্রের বিরোধ মিটে যাবার বদলে তা তীব্রতর হয়ে উঠল গিল্ড প্রভৃতি সুবিধার অপসারণে — এগুলির ফলে এ বিরোধ খানিকটা চাপা ছিল, — এবং গির্জার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপে। সামন্ততান্ত্রিক বাঁধন থেকে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা' অধুনা সত্যই অর্জিত হল এবং ক্ষুদে পুঁজিপতি ও ক্ষুদে কৃষক মালিকদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়াল বৃহৎ পুজিপতি ও জমিদারদের বিপু প্রতিযোগিতায় নিষ্পিষ্ট হয়ে এই সব মহা প্রভুদে নিকট নিজ নিজ ক্ষুদে সম্

পত্তি বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং এই ভাবে, ক্ষুদে পুঁজিপতি ও কৃষক মালিকদের দিক থেকে, তা হল 'সম্পতিত থেকে স্বাধীনতা'। পুঁজিবাদী ভিতিততে শিল্পের বিকাশের ফলে মেহনতী জনগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশই হল সমাজের অস্তিত্বের সর্ত। নগদ টাকা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল, কার্লাইলের বক্তব্য অনুসারে, মানুষে মানুষে একমাত্র সম্পর্ক (sole nexus)। বছরে বছরে বেড়ে উঠল অপরাধের সংখ্যা। আগে সামন্ত পাপকর্মগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলিই হেঁটে বেড়াত, এখন তারা উৎপাটিত না হলেও অন্ততপক্ষে পেছনে সরে গিয়েছিল। তার জায়গায় এযাবৎ যা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে সেই বুর্জোয়া পাপ আরো সতেজে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবসা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল প্রবঞ্চনা। বিপ্লবী সূত্রবাণীয় 'সৌভ্রাত্র্য'*৩৮ বাস্তবে রূপায়িত হল প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের বুজরুকি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। জবরদস্তি করে নিপীড়নের জায়গায় এল দুর্নীতি, সমাজ চালাবার প্রথম কারিকা হিসাবে তরবারির জায়গা নিল সোনা। প্রথম রাত্রির অধিকার সামন্ত ভূস্বামীদের হাত থেকে গেল বুর্জোয়া কলওয়ালাদের কাছে। গণিকাবৃত্তির বৃদ্ধি ঘটল অভূতপূর্ব রকমের। বিবাহ ব্যাপারটাও আগের মতোই গণিকাচারের আইনসঙ্গত একটা রূপ, সরকারী একটা আবরণ হয়েই রইল এবং তদুপরি, তার সঙ্গে যুক্ত হল একটা অঢেল ব্যভিচারের স্রোত।

সংক্ষেপে, দার্শনিকদের চমৎকার সব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলালে 'যুক্তির বিজয়' থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল এক তীব্র নৈরাশ্যকর ব্যঙ্গস্বরূপ। অভাব ছিল শুধু সে নৈরাশ্যকে সূতরবদ্ধ করার মতো মানুষের এবং তারা দেখা দিল শতাব্দীর পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮০২ সালে দেখা দিল সাঁ-সিমোঁর 'জেনেভা পত্রাবলী', ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হল ফুরিয়ের প্রথম রচনা যদিও তাঁর তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠে ১৭৯৯ সালেই ; ১৮০০ সালের ১লা জানুয়ারি রবার্ট ওয়েন নিউ ল্যানার্কের পরিচালনা গ্রহণ করেন।

এ সময়ে কিন্তু উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েত বৈরিতা তখনো বেশ অপরিণত। আধুনিক শিল্প সদ্য ইংলন্ডে শুরু হয়েছে, ফ্রান্সে তা তখনো অজানা। কিন্তু আধুনিক শিল্প একদিকে বাড়িয়ে তোলে এমন সব সংঘাত যাতে উৎফাদনের ধরনে একটা বিপ্লব তার পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপ অনিবার্য হয়ে পড়ে আর এ সংঘাত কেবল তৎসৃষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যেই নয়, তৎসৃষ্ট উৎপাদনশক্তি এবং বিনিময় রূপের মধ্যেও, — এবং অন্যদিকে, এই অতিকায় উৎপাদন-শক্তির অভ্যন্তরেই তা বিকশিত করে তোলে এ সংঘাতগুলির অবসানের উপায়। সুতরাং ১৮০০ সাল নাগাদ নতুন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সংঘাতগুলি যদি সদ্য আকার নিতে শুরু করে থাকে, তাহলে সে সংঘাত অবসানের উপায়ের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। 'সন্ত্রাসের শাসন' কালে প্যারিসের সর্বহারা জনগণ মুহূর্তের জন্য প্রভুত্ব পেয়েছিল এবং তার ফলে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই বুর্জোয়া বিপ্লবকে তারা বিজয়ী করে দেয়। কিন্তু তাই করতে গিয়ে তারা শুধু এই প্রমাণ করে যে, তদানীন্তন অবস্থায় তাদের আধিপত্য টিকে থাকা ছিল কী অসম্ভব। এই সর্বহারা জনগণ থেকে নতুন একটা শ্রেণীর কোষ-কেন্দ্র রূপে তখন সেই প্রথম যার বিবর্তিত হয়ে উঠেছে সেই প্রলেতারিয়েত তখনো স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মে অক্ষম, তারা দেখা দিয়েছে একটা নিপীড়িত দুঃখী সম্প্রদায় হিসাবে, আত্ম-সাহায্যে অক্ষম এই সম্প্রদায়কে যদি সাহায্য পেতে হয় তবে সে সাহায্য আসতে পারে বড়ো জোর বাইরে থেকে, নতুবা উপর থেকে।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অধীনস্থ হন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারাও। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা ও অপরিণত শ্রেণী পরিস্থিতির প্রতিসঙ্গী হল অপরিণত তত্ত্ব। অবিকশিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যা তখনো সুপ্ত তেমন সব সামাজিক সমস্যার সমাধান ইউটোপীয়রা বার করতে চাইল মাথা থেকে। সমাজ ছেয়ে গেছে কেবল অন্যায়ে, তা দূরীকরণের দায় যুক্তির। সুতরাং দরকার হল একটা নতুন ও আরো নিখুঁত সমাজব্যবস্থা আবিষ্কার করে তা বাইরে থেকে প্রচারের জোরে এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেও সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই নতুন সমাজব্যবস্থাগুলি ইউটোপীয় হতে বাধ্য ; যতই সবিস্তারে তাদের পরিপূর্ণ করে রচনা করা হতে লাগল ততই বিশুদ্ধ উৎকল্পনায় ভেসে না গিয়ে তাদের উপায় রইল না।

এই কথগুলো একবার প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্নটার এই দিকটা নিয়ে আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই — এ এখন সবই অতীতের বিষয়। সে কাজ আমরা ছেড়ে দিতে পারি ক্ষুদে সাহিত্যিকদের জন্য — এই যে সব উৎকল্পনায় আজ আমাদের মাত্র হাসি পায়, তার ওপর সগাম্ভীর্যে ঠোকর মেরে এরূপ 'পাগলামির' তুলনায় নিজেদের পাকাবুদ্ধির উৎকর্ষ নিয়ে এঁরা কাকলী করুন। আমাদের আনন্দ বরং সেই সব মহামহীয়ান ভাবনা ও ভাবনার বীজ নিয়ে যা তাঁদের উৎকল্পী খোলস থেকে সর্বত্রই ফেটে বেরিয়েছে এবং যার প্রতি এই কূপমন্ডূকেরা অন্ধ।

সাঁ-সিমোঁ মহান ফরাসী বিপ্লবের সন্তান, এ বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন তার বয়স তিরিশও নয়। এ বিপ্লবে জয় হয় তৃতীয় সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ সুবিধাভোগী অলস শ্রেণীগুলির ওপর উৎপাদন ও ব্যবসায় যাা খাটছে জাতির সেই বিপুল জনগণের জয়। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিজয় অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল এই সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বীয় বিজয়রূপে, এ সম্প্রদায়ের সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী অংশের অর্থাৎ সম্পত্তি-মালিক বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতালাভরূপে। বিপ্লবের ভেতর বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই দ্রুত বিকশিত উঠেছিল — অভিজাতদের ও গির্জার যে জমি

বাজেয়াপ্ত করে পরে বিক্রির জন্য হাজির করা হয় তার ওপর ফাটকাবাজি করে খানিকটা, এবং খানিকটা যুদ্ধ ঠিকার মারফত জাতিকে ঠকিয়ে। এই জুয়াচোরদের আধিপত্যের ফলেই ডিরেক্টরেটের আমলে ফ্রান্স ধ্বংসের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নেপোলিয়ন অজুহাত পান কুদেতার।

সুতরাং, সাঁ-সিমোঁর কাছে তৃতীয় সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেকার বৈরিতাটা 'কর্মী' ও 'নিষ্কর্মাদের' মধ্যস্থ একটা বৈরিতারূপে দেখা দেয়। শুধু সাবেকি সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, উৎপাদন ও বিতরণে অংশ না নিয়ে যারা তাদের আয়ের ওপর বসে খায় তারা সকলেই নিষ্কর্মা। কর্মীও শুধু মজুরি-খাটা শ্রমিক নয়, কলওয়ালা বণিক ব্যাঙ্কার — সকলেই। নিষ্কর্মারা যে মনীষাগত নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের ক্ষমতা হারিয়েছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল এবং পাকাপাকি স্থির হয়ে যায় বিপ্লবে। সর্বহারা শ্রেণীগুলিরও যে সে-ক্ষমতা নেই সেটা সাঁ-সিমোঁর মনে হয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনের' অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে পরিচালনা করবে, নায়কত্ব করবে কে? সাঁ-সিমোঁর মতো করবে নতুন একটা ধর্মীয় বন্ধনে মিলিত বিজ্ঞান ও শিল্প, এ ধর্মবন্ধনের নির্বন্ধ হল ধর্মীয় ভাবনার সেই ঐক্য পুনরুদ্ধার করা যা রিফর্মেশনের সময় থেকে নষ্ট হয়ে গেছে, — অবশ্যই অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কড়া রকমের যাজকতন্ত্রী 'নবখৃষ্টবাদ'। বিজ্ঞান অর্থে হল পন্ডিতবর্গ, এবং শিল্প, সে হল সর্বাগ্রে সক্রিয় বুর্জোয়া, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার। সাঁ-সিমোঁর অভিপ্রায় ছিল, এ বুর্জোয়াদের অবশ্যই রূপান্তরিত হতে হবে এক ধরনের জনকর্মচারী, সামাজিক অছিদাররূপে ; কিন্তু মজুরদের তুলনায় নেতৃত্বকারী ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত একটা অবস্থান তাদের তখনো থাকবে। ব্যাঙ্কারদের বিশেষ করে ডাক দেওয়া হবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত করতে। এ ধারণাটা ঠিক তেমন একটা সময়ের সঙ্গে খাপ খায় যখন ফ্রান্সে আধুনিক শিল্প এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার গহ্বরটা সবে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ বিশেষ জোর যেখানে দেন সেটা এই : সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবনা ছিল সেই শ্রেণীর ভাগ্য নিয়ে যারা সবচেয়ে সংখ্যাধিক ও সবচেয়ে গরিব ('la classe la plus nombreuse et la plus pauvre')।

'জেনেভা পত্রাবলী'তেই সাঁ-সিমোঁ প্রস্তাব তুলেছিলেন, 'সমস্ত লোককেই কাজ করতে হবে।' ঐ রচনায় তিনি এ কথাও বলেন যে, সন্ত্রাসের শাসন ছিল সর্বহারা জনগণের শাসন। সর্বহারাদের তিনি বলেছেন, 'দ্যাখো, তোমাদের সাথীরা যখন ফ্রান্সে আধিপত্য করে তখন কী দাঁড়ায় ; তারা একটা দুর্ভিক্ষ ঘটায়।' কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে শ্রেণী-যুদ্ধ হিসবে, শুধু অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ নয়, অভিজাত বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ হিসাবে দেখা ১৮০২ সালের পক্ষে একটা অতি অর্থগর্ভ। আবিষ্কার। ১৮১৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, রাজনীতি হল উৎপাদনের বিজ্ঞান, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক অবস্থা যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ, এ জ্ঞান এখানে মাত্র ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছে। তবু তখনই যা বেশ পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে সে হল এই ধারণা যে, ভবিষ্যতে মানুষের ওপরকার রাজনৈতিক শাসন পরিবর্তিত হবে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনায়, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের বিলোপে', যা নিয়ে ইদানীং এত সোরগোল চলেছে।

সমকালীনদের তুলনায় একই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় সাঁ-সিমোঁ দেন ১৮১৪ সালে, মিত্রশক্তিদের প্যারিস প্রবেশের ঠিক পরেই, এবং ফের ১৮১৫ সালে একশ দিনের*৩৯ যুদ্ধের সময় যখন তিনি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলন্ডের এবং পরে এই দুই দেশের সঙ্গে জার্মানির মৈত্রীই হল ইউরোপের সমৃদ্ধ বিকাশ ও শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ওয়াটার্লু যুদ্ধের*৪০ বিজয়ীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা ১৮১৫ সালে ফরাসীদের কাছে প্রচার করতে হলে যেমন সাহস তেমনি ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হত।

সাঁ-সিমোঁর মধ্যে যদি পাই একটা এমন পরিপূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টি যাতে পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যে সব ধারণা একান্তভাবে অর্থনৈতিক নয় তার প্রায় সবগুলিই তাঁর মধ্যে ভ্রূণাকারে বর্তমান, তাহলে ফুরিয়ের মধ্যে পাব তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার একটা খাঁটি ফরাসী চালের ক্ষুরধার সরস সমালোচনা, কিন্তু তাই বলে মোটেই তা কম গভীর নয়। ফুয়িয়ে বুর্জোয়াকে ধরেছেন, ধরেছেন তাদের বিপ্লবপূর্বের অনুপ্রেরিত পয়গম্বর আর বিপ্লবোত্তর স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের স্বমুখনিসৃত উক্তিগুলিকেই। বুর্জোয়া জগতের বৈষয়িক ও নৈতিক দৈন্য তিনি উদ্ভাগটিত করেছেন নির্মমভাবে। একমাতর যুক্তি-শাসিত একটা সমাজ, সার্বজনীন সুখের একটা সভ্যতা, মানুষের অসীম একটা পরিপূর্ণতার যে ঝলকিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বতন দার্শনিকেরা এবং তাঁর কালের বুর্জোয়া প্রবক্তারা যে সব রঙীন বুলি আওড়াতেন তার মুখোমুখি তিনি দাঁড় করিয়ে দেন বুর্জোয়া জগতটাকে। দেখিয়ে দেন কী ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বাগাড়ম্বরের তলে আছে অতি শোচনীয় বাস্তব এবং বাক্যের এই অপদার্থ প্রহসনকে তিনি দীর্ণ করেছেন জ্বালাময় ব্যঙ্গে।

ফুরিয়ে শুধু সমালোচক নন ; তাঁর অনুত্তেজিত ধীর স্বভাব তাঁকে করে তুলেছে ব্যঙ্গবিদ, এবং নিঃসন্দেহ সর্বকালের সেরা ব্যঙ্গবিদদের অন্যতম। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর করে তিনি বর্ণা করেছেন বিপ্লবের পতনের পর যে জুয়াচুরি ফাটকাবাজির মহোৎসব শুরু হয়, সে সময়কার ফরাসী বাণিজ্যের মধ্যে এবং তারই বৈশিষ্ট্যসূচক যে

দোকানদারি মনোবৃত্তিত তখন প্রচলিত, তার কথা। এর চেয়েও তাঁর ওস্তাদি নরনারী সম্পর্কের বুর্জোয়া রূপ এবং বুর্জোয়া সমাজে নারীর যে স্থান তার সমালোচনায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, কোনো একটা সমাজের সাধারণ মুক্তির স্বাভাবিক মাপকাঠি হল সে সমাজে নারী মুক্তির মান।

কিন্তু সমাজের ঐতিহাসিক ধারণার ক্ষেত্রেই ফুরিয়ে মহত্তম। সমাজের সমগ্র ধারাকে তিনি ভাগ করেছেন ক্রমবিকাশের চারটি পর্যায়ে — বন্যতা, বর্বরতা, পিতৃতন্ত্র, সভ্যতা। শেষেরটি হল আজকের তথাকথিত সভ্য বা বুর্জোয়া সমাজ অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে সমাজের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেন, 'বর্বরতার যুগে যে পাপের অনুষ্ঠান হত সরল ভাবে তাদের সবকটিকেই একটা জটিল দ্ব্যর্থক উভচারী শাঠ্যের অস্তিত্বে উন্নীত করা হয়েছে সভ্য যুগে' ; সভ্যতার গতি একটা 'পাপ চক্রে'র মধ্য দিয়ে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, যা সে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে অথচ তার সমাধানে অক্ষম ; সুতরাং যা তার অভিপ্রেত অথবা অভিপ্রেত বলে ভান করে ঠিক তার বিপরীতেই সে ক্রমাগত উপনীত হচ্ছে, ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সভ্যতার আমলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে অতি প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই।'

দেখা যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ফুরিয়ে ঠিক তাঁর সমকালীন হেগেলের মতোই নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই দ্বান্দ্বিকতার ব্যবহার করে তিনি সীমাহীন মানবিক পরিপূর্ণতার বরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, বলেছেন, প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক পর্যায়েরই যেমন উত্থান তেমনি অবতরণের যুগ বর্তমান, এবং এই সত্যকে প্রয়োগ করেছেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেতের। পৃথিবীর শেষ পরিণাম ধ্বংস, এই ধারণাটি ক্যান্ট যেমন আমদানি করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ফুরিয়েও তেমনি ইতিহাস বিজ্ঞানে চালু করেন মনুষ্য জাতির শেষ ধ্বংসের ধারণা।

ফ্রান্সের মাটির ওপর দিয়ে যখন বিপ্লবের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তখন ইংলন্ডে চলছিল একটা শান্ততর বিপ্লব যদিও তাই বলে সেটা কম প্রচণ্ড নয়। বাষ্প এবং নতুন নতুন যন্ত্র-তৈরির সরঞ্জামে কারখানা (manufacture) পরিবর্তিত হচ্ছিল আধুনিক শিল্পে এবং এই ভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছিল বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র ভিত্তিমূলেই। কারখানা-যুগের বিকাশের মন্থর গতি বদলে গেল উৎপাদনের একটা ঝটিকাবর্তের যুগরূপে। নিয়ত বর্ধমান ক্ষিপ্রতায় চলল বৃহৎ পুঁজিপতি ও নির্বৃত্ত প্রলেতারিয়েতে সমাজের ভাঙন। তাদের মাঝখানে, আগেকার স্থায়ী মধ্য শ্রেণীর বদলে কারুশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানদারদের একটা অস্থায়ী জনসংঘ, জনসংখ্যার সবচেয়ে অস্থির একটা অংশ, কষ্টে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল।

উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি তখন সবে তার উত্থান যুগের শুরুতে ; তখনো পর্যন্ত সেটা উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মিত একটা পদ্ধতিই বটে, তদানীন্তন অবস্থায় সম্ভবপর একমাত্র পদ্ধতি। তাহলেও, তখনই তা থেকে বিপুল সামাজিক অবিচারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে — বড়ো বড়ো শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সব মহল্লায় গৃহহীন জনতার ভিড়, চিরাচরিত সবকিছু নৈতিক বাঁধন, পিতৃতান্ত্রিক বাধ্যতা, পারিবারিক সম্পর্কের শৈথিল্য ; একটা ভয়ঙ্কর মাত্রার অতি মেহনত, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বেলায় ; গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে আধুনিক শিল্প, জীবন ধারণের স্থির অবস্থা থেকে দিন দিন পরিবর্তমান একটা অস্থির অবস্থা — একেবারে এই নতুন পরিস্থিতির মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক নীতিভ্রংশ।

এই সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এলেন একজন সংস্কারক, ২৯ বছর বয়সের এক কারখানা-মালিক, প্রায় অনির্বচনীয় শিশুসুলভ একটা সারল্য তাঁর চরিত্রে, অথচ সেই সঙ্গেই যে মুষ্টিমেয়রা জন-নায়ক হয়েই জন্মায় তাদের একজন। রবার্ট ওয়েন বস্তুবাদী দার্শনিকদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ, মানুষের চরিত্র হল একদিকে বংশগতি এবং অন্যদিকে মানুষের জীবন-কালের, বিশেষ করে তার বিকাশ-কালের পরিবেশের ফল। তাঁর শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দেখেছিল কেবল গোলমাল বিশৃঙ্খলা, আর দাঁও মেরে দ্রুত প্রভূত টাকা করার সুবিধা। রবার্ট ওয়েন দেখলেন তাঁর প্রিয় তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা কারখানায় পাঁচ শতাধিক লোকের সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে এটা তিনি আগেই সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ১৮০০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্কে পরিচালাক অংশীদার হিসাবে একটি বৃহৎ সূতাকলের কাজ চালান সেই একই পদ্ধতিতে, কিন্তু অধিকতর স্বাধীনতা নিয়ে এবং এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে যাা ছিল অতি হরেক রকমের একটা দঙ্গল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি নীতিভ্রষ্ট সব লোক, এবং ধীরে ধীরে যাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠে ২,৫০০-এ এমন একটা জনতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন এক আদর্শ উপনিবেশে, যেখানে মাতলামি, পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট, মোকদ্দমা, দীন আইন (poor laws), ভিক্ষাদান প্রভৃতি ছিল অজানা। এবং তা করেন মাত্র লোকগুলোর জন্য একটা মানুষের যোগ্য পরিস্থিতি রচনা করে এবং বিশেষ করে, উঠতি ছেলেমেয়েদের সযত্নে লালন করে। কিন্ডারগার্টেনে, সেখানে তারা এতই আনন্দে থাকত যে, বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া দায় হত। ওয়েনের প্রতিযোগীরা যে ক্ষেত্রে মজুর খাটাত দিন তের-চোদ্দ ঘন্টা করে, সে ক্ষেত্রে নিউ ল্যানার্কে কাজের দিন ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘন্টা। তূলার একটা সংকটে যখন চার মাসের জন্য কাজ বন্ধ থাকে, তখনো তাঁর মজুরেরা পুরো মজুরি পেয়ে এসেছে। এবং এ সব সত্ত্বেও কারবারের মূল্য দ্বিগুণ বাড়ে, শেষ পর্যন্ত তা মোট মুনাফা

জুগিয়েছে মালিকদের।

তা সত্ত্বেও ওয়েনের তৃপ্তি ছিল না। তাঁর মজুরদের জন্য তিনি জীবন ধারণের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা তাঁর চোখে তখনো মানুষের যোগ্য নয়। 'লোকগুলো আমার করুণানির্ভর ক্রীতদাস।' অপেক্ষাকৃত অনুকূল যে পরিস্থিতিতে তাদের তিনি বসিয়েছেন তাতে চরিত্রের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাঙ্গীন ও সঙ্গত বিকাশ তখনো হচ্ছিল না, তাদে যোগ্যতার অবাধ ব্যবহার হচ্ছিল তো আরো কম। 'অথচ এই আড়াই হাজার অধিবাসীর মেহনতী অংশটা সমাজের জন্য যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছে তা করতে প্রায় অর্ধশতক আগে দরকার হত ছয় লক্ষ অধিবাসীর মেহনতী অংশের। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ছয় লক্ষ লোক যে সম্পদ ভোগ করত, সে থেকে এই আড়াই হাজার লোক যা ভোগ করছে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকা উচিত সেটা গেল কোথায়?'*৪১

জবাবটা পরিষ্কার। তা গেছে তিন লক্ষ পাউন্ডের ছাঁকা মুনাফা ছাড়াও কারখানার স্বত্বাধিকারীদের লগ্নী মূলধনের ওপর ৫% পশিোধ করতে। আর নিউ ল্যানার্কের পক্ষে যেটা খাটে, তা আরে বেশি খাটে ইংলন্ডের সমস্ত ফ্যাক্টরি সম্পর্কেই।' অযথার্থরূপে প্রযুক্ত হলেও যন্ত্র কর্তৃক এই নতুন সম্পদ যদি না সৃষ্টি হত, তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং সমাজের অভিজাত প্রথাকে সমর্থনের জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি চালান যেত না। অথচ এই নতুন শক্তি হল শ্রমিক শ্রেণীরই সৃষ্টি।'*৪২ এ নতুন শক্তির ফল ভোগের অধিকার সুতরাং তাদেরই। নবসৃষ্ট অতিকায় উৎপাদন-শক্তি এযাবৎ যা ব্যক্তিবিশেষকে ধীন করা ও জনগণকে গোলাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে ওয়েন পেলেন সমাজ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি; সকলের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে এগুলির নির্বন্ধ হল সকলের সাধারণ মঙ্গলের জন্য চালিত হওয়া।

বলা যেতে পারে ব্যবসায়িক হিসাবের পরিণতিস্বরূপ এই বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বনিয়াদে ওপরেই ওয়েনের কমিউনিজমে ভিত্তি। আগাগোড়া তাঁর এই ব্যবহারিক চরিত্র বজায় থেকেছে। এই ভাবে, ১৮২৩ সালে ওয়েন কমিউনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন করে আয়র্ল্যান্ডের দুর্দশা ত্রাণের প্রস্তাব তোলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার খরচা, বাৎসরিক ব্যয় ও সম্ভাব্য আয়ের পুরো হিসাব তৈরি করে দেন। ভবিষ্যতের জন্য স্থির নির্দিষ্ট তাঁর ছকে খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এমন ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে যে — ভিতের নকসা, সামনে থেকে দেখা, পাশ থেকে দেখা, উপর থেকে দেখা, সব সমেত — সমাজ সংস্কারের ওয়েন পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে তার প্রত্যক্ষ খুঁটিনাটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপত্তি করার প্রায় জো নেই।

কমিউনিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ করায় জীবনের মোড় ফিরে গেল ওয়েনের। যতদিন তিনি মাত্র মানবহিতৈষী, ততদিন কেবল ধনসম্পদ, সাধুবাদ সম্মান ও গৌরবের পুরস্কার মিলেছে তাঁর। তিনি ছিলেন ইউরোপের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। শুধু স্বশ্রেণীর লোকেরাই নয়, রাষ্ট্রনেতারা, এমনকি প্রিন্সরাও তাঁর কথা শুনত সপ্রশংসায়। কিন্তু যখন তিনি তাঁর কমিউনিস্ট তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন সে তো আলাদা কথা। ওয়েনের মনে হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পথ রোধ করে আছে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক : ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও বর্তমানের বিবাহ প্রথা। জানতেন, এদের আক্রমণ করলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে — অবৈধীকরণ, সরকারী সমাজ থেকে বহিষ্কার, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবসান। কিন্তু ফলাফলের তোয়াক্কা না রেখে সে আক্রমণ করতে কিছুতেই তিনি পিছপা হলেন না; এবং যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। সরকারী সমাজ থেকে নির্বাসন, সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে নীরবতার চক্রান্ত। আমেরিকায় তাঁর অসফল কমিউনিস্ট পরীক্ষায় নিজের সমস্ত সম্পদ ঢেলেছিলেন। সে সব খুইয়ে তিনি সরাসরি ফিরলেন শ্রমিক শ্রেণীর দিকে, তাদের মধ্যেই কাজ করে যান তিরিশ বছর। ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রত্যেকটা সামাজিক আন্দোলন, প্রত্যেকটি সত্যকার অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের নাম জড়িত। পাঁচ বছর সংগ্রামের পর, ১৮১৯ সালে তিনি ফ্যাক্টরিতে নারী ও শিশুদের কাজের ঘন্টা সীমাবদ্ধ করার আইন জোর করে পাশ করিয়ে নেন। ইংলন্ডের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যখন একটা বৃহৎ একক সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তারই প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সমাজে পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠনের আগে উৎক্রমণ ব্যবস্থা হিসাবে তিনি একদিকে প্রবর্তন করেন খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের জন্য সমবায় সমিতি। সেদিন থেকে অন্তত এই ব্যবহারিক প্রমাণ এগুলি দিয়ে এসেছে যে, সমাজের দিক থেকে বণিক ও কলওয়ালারা নিতান্ত অনাবশ্যক। অনদিকে তিনি প্রবর্তন করেন মেহনত-নোট মারফত মেহনতের ফল বিনিময়ের জন্য মেহনতী বাজার; এই মেহনত-নোটের একক ধা হয় এক ঘন্টার কাজ; প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অনেক পরবর্তী কালের প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রকল্পটা আগে থেকেই পুরোপুরি আচরিত হয়েছে এখানেই — শুধু এই তফাৎ যে একেই সমাজের সর্ব অকল্যাণের মহৌষধ বলে জাহির না করে বলা হয়েছে সমাজের অধিকতর একটা আমূল বিপ্লবের দিকে তা এক প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

ইউটোপীয় চিন্তাধারা ঊনিশ শতকের সমাজতন্ত্রী ভাবনাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে এসেছে এবং এখনো কিছু কিছু ভাবনাকে করছে। এই কিছুদিন আগেও ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা সকলেই তার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। ভাইৎলিং-এর কমিউনিজম সমেত আগেকার জার্মান কমিউনিজমও ওই একই পন্থার পথিক। এদের সকলের কাছেই

সমাজতন্ত্র হল পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ ; আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তার শক্তিতেই তা বিশ্বজয় করবে। এবং পরম সত্য যেহেতু দেশ কাল ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ নিরপেক্ষ, তাই কখন কোথায় সেটা আবিষ্কৃত হবে সেটা দৈবের ঘটনা। তা সত্ত্বেও এক একটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু এক একরম। এবং প্রত্যেকের এই বিশেষ প্রকারের পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু তার স্বীয় বোধ, জীবন ধারণের অবস্থা, জ্ঞানের বহর ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুশীলন দ্বারা নির্ধারিত সেই হেতু পরম সত্যগুলির সংঘাতের শুধু এইটে ছাড়া অন্য পরিণাম অসম্ভব যে, সেগুলি হবে একান্তরূপে পরস্পর পৃথক। এ থেকে শুধু এক ধরনের পাঁচমিশালী গড়পড়তা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরবে না এবং বস্তুতপক্ষে তাই আজও পর্যন্ত ফান্স ও ইংলন্ডের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী-শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। অতএব সে হচ্ছে অতি বহুবিধ মতান্তরের এক জগাখিচুড়ি অনুমোদন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনী রচনা, অর্থনৈতিক তত্তব ও ভবিষ্যৎ সমাজ চিত্রের জগাখিচুড়ি, যার বিরোধিতা হবে সবচেয়ে কম ; বিতর্কের স্রোতে বিভিন্ন উপাদানের সুনির্দিষ্ট তীক্ষ্ণ ধারগুলো যতই নদীর গোল গোল নুড়ির মতো মসৃণ হয়ে উঠবে, সে জগাখিচুড়িও তৈরি হয়ে উঠবে ততই সহজে।

সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে আগে তাকে স্থাপন করা দরকার বাস্তব ভিত্তির ওপর।

২

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার পরে দেখা দেয় নতুন জার্মান দর্শন, যার পরিণতি হেগেলে। এ দর্শনের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল যুক্তির উচ্চতম ধরন হিসবে দ্বান্দ্বিকতার পুনর্প্রবর্তন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন স্বভাবদ্বান্দ্বিক এবং এদের মধ্যেকার সবচেয়ে বিশ্বকৌষিক প্রতিভা আরিস্টটল দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির বিশ্লেষণ আগেই করে গেছেন। অন্যপক্ষে, নবতর দর্শনের মধ্যে যদিও দ্বান্দ্বিকতার চমৎকার প্রবক্তারাও ছিলেন (যথা, দেকার্ত, স্পিনোজা) তবু বিশেষ করে ইংরেজদের প্রভাবে তা ক্রমেই তথাকথিত আধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) যুক্তিপ্রকরণে স্থিতি লাভ করে, — অস্টাদশ শতকের ফরাসীরাও তাদ্বারা প্রায় পুরোপুরি প্রভাবিত হয়, অন্ততপক্ষে তাদের যে রচনা বিশেষ করে দার্শনিক সেগুলির ক্ষেত্রে। সংকীর্ণ অর্থে যা দর্শন তার বাইরে ফরাসীরা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার সেরা কীর্তি রচনা করেছেন। দিদেরোর Le Neveu du Rameau ('রামোর ভাইপো') এবং রুসোর Discours sur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes ('মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব') স্মরণ করলেই যথেষ্ট। এ দুই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

সাধারণ নিসর্গ বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি ও তাই নিয়ে ভাবি তখন সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে একটা সম্পর্কপাত ও প্রতিক্রিয়ার, বিন্যাস (permutations) ও সমবায়ের (combinations) নিঃশেষ জড়াজড়ি, যেখানে কিছুই যা ছিল, যেখানে ছিল এবং যেমন ছিল তা থাকে না, সবকিছুই সরে যায়, বদলায়, উদ্ভূত হয় ও লোপ পায়। সুতরাং প্রথমে আমরা ছবিটা দেখি সমগ্রভাবে, তার আলাদা আলাদা অংশগুলো তখনো মোটের ওপর থাকে পশ্চাৎপটে ; এগুচ্ছে, সমাহৃত হচ্ছে, সম্পর্কিত হচ্ছে যে বস্তুগুলো তাদের বদলে লক্ষ্য পড়ে বরং গতির ওপর, রূপান্তরের ওপর, সম্পর্কপাতের ওপর। বিশ্বের এই আদিম সরল কিন্তু মূলত সঠিক যে বোধ সেটা প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বোধ এবং তা প্রথম পরিষ্কার করে নিরূপণ করেন হেরাক্লিটস : সবকিছুই আছে তবু নেই, কারণ সবকিছুই প্রবহমান, নিয়ত পরিবর্তমান, নিয়তই তার উদ্ভব ও বিলয়।

কিন্তু ঘটনাবলীর সামগ্রিক ছবির সাধারণ চরিত্র সঠিক প্রকাশ করলেও যে সব খুঁটিনাটি অংশ দিয়ে এ ছবি তৈরি তার ব্যাখ্যার দিক থেকে এ বোধ অপ্রতুল এবং যতক্ষণ এই সব খুঁটিনাটি আমরা না বুঝছি ততক্ষণ গোটা ছবিটার পরিষ্কার ধারণা হতে পারে না। এই খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এনে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে তার প্রকৃতি, বিশেষ কারণ, ফলাফল ইত্যাদি। মূলত এ কাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও এতিহাসিক গবেষণার, এগুলি বিজ্ঞানের এমন শাখা যা পৌরাণিক গ্রীকেরা সুযুক্তিতেই একটা গৌণ জায়গায় ঠেলে রেখেছিল, কারণ এ বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করবে তার মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে আগে। কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহ করার আগে কোনো বিচারমূলক বিশ্লেষণ, তুলনা, এবং শ্রেণী, ধারা ও প্রজাতিরূপে তার বিন্যাস হতে পারে না। যথাযথ প্রকৃতিবিজ্ঞানের (exact natural sciences) ভিতিত তাই প্রথম রচিত হয় আলেকজেন্ড্রীয় যুগের*৪৩ গ্রীকদের দ্বারা এবং পরে বিকশিত হয় মধ্য যুগে আরবদের দ্বারা। সত্যকারের প্রকৃতিবিজ্ঞান শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, এবং তদবধি ক্রমবর্ধমান দ্রুততায় তা নিয়ত এগিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা অংশে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বর্গে প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও বস্তুর সন্নিবেশ, বহুবিধ রূপের জৈব বস্তুর আভ্যন্তরীণ শারীরস্থান অধ্যয়ন — গত চারশ' বছরে আমাদের প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে অতিকায় পদক্ষেপ হয়েছে তার মূল সর্ত ছিল এইগুলি। কিন্তু এ কাজের এ ধরনের ফলে প্রাকৃতিক

বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, বিপুল সমগ্রটা থেকে তাকে সম্পর্কচ্যুত করে দেখার একটা অভ্যাস আমরা ঐতিহ্য হিসাবে পেয়েছি ; তাদের দেখা গতির মধ্যে নয় স্থিতির মধ্যে, মূলত পরিবর্তমান বস্তু হিসাবে নয়, নিয়ত স্থির বস্তু হিসাবে, জীবনের মধ্যে নয়, মরণের মধ্যে। বেকন ও লক কর্তৃক এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে দর্শনে আনীত হল, তখন তার মধ্যে দেখা দিল গত শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক সংকীর্ণ অধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা।

যিনি অধিবিদ্যক (metaphysician) তাঁর কাছে বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ ভাবনাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বিচার করতে হবে একে একে, পরস্পর থেকে আলাদাভাবে, অনুসন্ধান বস্তু হিসাবে এগুলি স্থির অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। অধিবিদ্যকের চিন্তা একান্তরূপে দুরপনেয় প্রতিতত্ত্বের (antitheses) ধারায়, 'তাহার বাণী, "ইতি ইতি বা নেতি নেতি", কারণ ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা আসিতেছে শয়তানের নিকট হইতে।' তাঁর কাছে একটা বস্তু হয় আছে, নয় নেই। একটা বস্তু একই কালে সেই বস্তু ও অন্য বস্তু হতে পারে না। ইতির সঙ্গে নেতির কোনো সম্পর্ক নেই ; কার্য ও কারণ অনড় প্রতিতত্ত্ব-যুক্ত।

প্রথম দৃষ্টিতে এ ধরনের চিন্তা আমাদের কাছে ভারি ভাস্বর লাগে, কারণ এ হল তথাকথিত পাকা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু নিজের চার দেয়ালের মধ্যেকার সংসারে পাকা সাধারণ বুদ্ধিটাকে বেশ ভদ্রস্থ দেখালেও যেই সে গবেষণার ব্যাপক দুনিয়ায় পা বাড়ায় অমনি অতি আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হতে থাকে তার। অধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, — নির্দিষ্ট বিচার্য বস্তুটির প্রকৃতির অনুসারে সে ক্ষেত্রের পরিমাণ বদলায়, — কিন্তু তাহলেও, কালক্রমেই এ চিন্তাধারা একটা সীমায় পৌঁছয়, তার বাইরে গেলেই তা একপেশে সীমাবদ্ধ বিমূর্ত হয়ে পড়ে, সমাধানহীন বিরোধের মধ্যে পথ হারায়। আলাদা আলাদা বস্তুর বিচারে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সে ভুলে যায়, বিদ্যমানতার বিচারে ভুলে যায় সে বিদ্যমানতার শুরু ও শেষের কথা ; স্থিতির বিচারে ভোলে গতির কথা ; গাছ দেখে, দেখে না অরণ্য।

দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেমন জানি ও বলতে পারি, একটা প্রাণী জীবিত কি মৃত। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচারের পর দেখা যাবে যে, বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা অতি জটিল, আইনজ্ঞরা তা ভালোই জানেন। মাতৃগর্ভে কোন যুক্তিসিদ্ধ সীমার পর শিশুকে হত্যা করলে তাকে খুন বলা যাবে, তা আবিষ্কার করতে তাঁরা বৃথাই মাথা ঠুকেছেন। মৃত্যুর একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করাও সমান অসম্ভব কেননা, শারীরবৃত্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু একটা তাৎক্ষণিক, মুহূর্তের ঘটনা নয়, অতি দীর্ঘায়ত একটা প্রক্রিয়া।

একই ভাবে, প্রতিটি জৈব সত্তাও প্রতিমুহূর্তেই সেই একই সত্তা এবং সেই সত্তা নয়ও ; প্রতিমুহূর্তে তা বাইরে থেকে পদার্থ আত্মস্থ করছে এবং অন্য পদার্থ পরিত্যাগ করছে ; প্রতি মুহূর্তে তার দেহের কোনো কোষের মৃত্যু হচ্ছে, কোনো কোষের জন্ম হচ্ছে ; দীর্ঘ বা স্বল্প কালের মধ্যে তার দেহের পদার্থ সম্পূর্ণ নবায়িত হয়ে উঠছে, তার স্থান নিচ্ছে অন্য পরমাণু, ফলে প্রত্যেকটা জৈব সত্তাই সর্বদাই সেই বটে তবু সে নয়।

অপিচ, গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রতিতত্ত্বের (antithesis) দুই মেরু অর্থাৎ সদর্থক ও নঞর্থক প্রান্তদুটি যে পরিমাণ পরস্পরবিরোধী সেই পরিমাণেই অবিচ্ছেদ্য, এবং যতকিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। একই ভাবেই দেখা যায়, কার্য ও কারণ সম্পর্কে যে বোধ সেটা শুধু বিচ্ছিন্ন এক একটা ঘটনার ক্ষেত্রেই খাটে, কিন্তু এই আলাদাদ আলাদা ঘটনাগুলি যেই সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হয় তখনই সে কার্যকারণ পরস্পর প্রতিধাবিত হয় এবং কার্যকারণ যেখানে নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, সেই বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা যখন ভাবি তখন ও কার্যকারণ বোধ একেবারে গুলিয়ে যায়, ফলে একটা ক্ষেত্রে ও একটা মুহূর্তে যা কার্য অন্য ক্ষেত্রে ও অন্য মুহূর্তে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তেমনি আবার কারণও হয়ে দাঁড়ায় কার্য।

অধিবিদ্যক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া ও ভাবনা-ধারার কোনোটাই আঁটে না। পক্ষান্তরে, দ্বান্দ্বিকতায় মূল সম্পর্ক, গ্রন্থিপরম্পরা, গতি, উদ্ভব ও অবসানের মধ্যে বস্তু ও তার উপস্থাপন বা ভাবনা অনুধ্যেয়। উপরে যে সব প্রক্রিয়ার কথা বলা হল তা তার স্বীয় কর্মপদ্ধতিরই কতকগুলি সমর্থন।

দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন বর্ধমান অতি মূল্যবান মালমশলা দিয়ে এ প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে, প্রকৃতির ক্রিয়া অধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক ; নিয়ত পৌনঃপুনিক একটা বৃত্তে চিরকালের জন্য একই ভাবে সে ঘোরে না, সত্যকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। প্রকৃতির অধিবিদ্যক বোধের বিরুদ্ধে তিনি গুরুতম আঘাত হানেন এইটে প্রমাণ করে যে, সমস্ত জৈব সত্তা, উদ্ভিবদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন এমন প্রকৃতিবিদের সংখ্যা খুবই কম ; এবং তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধুনা যে অশেষ বিভ্রান্তি বর্তমান, শিক্ষক ও

শিক্ষার্থী, রচয়িতা ও পাঠক সকলের মধ্যেই যে সমান হতাশা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল ভাবনার পূর্বাভ্যস্ত ধরনের সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলাফলগুলির এই সংঘাত।

তাই বিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের এবং মনুষ্যমনে এ বিবর্তনের যে প্রতিফলন, তার সঠিক উপস্থাপন সম্ভব হতে পারে কেবল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে, যাতে জীবন ও মৃত্যুর, অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী পরিবর্তনের অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতি অবিরাম লক্ষ্য রাখা হয়। নতুন জার্মান দর্শন এই প্রেরণাতেই এগিয়েছে। বিখ্যাত হৈ প্রাথমিক অভিঘাত (impulse) একবার পাবার পর সৌরমন্ডলের অটলত্ব ও চিরন্তন স্থায়িত্বের নিউটনীয় ছককে ভেঙে দিয়ে ঘূর্ণ্যমান বাষ্পস্তূপ (nebulous mass) থেকে সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টি, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দেখিয়ে ক্যান্ট শুরু করেন। তা থেকে তিনি সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত টানেন যে, সৌরমন্ডলের এই যদি উৎপত্তি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অনিবার্য। অর্ধ শতাব্দী পর বর্ণালী যন্ত্র (spectroscope) প্রমাণ করে যে, মহাশূন্যে ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ধরনের ভাস্বর বাষ্পস্তূপ বর্তমান।

নতুন এই জার্মান দর্শন পরিণতি পেল হেগেলে তন্ত্রে। এ তন্ত্রে,—এবং এইটেই তার বড়ো গুণ — এই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিমার্গীয়, সমগ্র বিশ্বই উপস্থাপিত হল একটা প্রক্রিয়ারূপে অর্থাৎ, অবিরত গতি, পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশরূপে ; এবং এই সমস্ত গতি ও বিকাশ যাতে একটা অখণ্ড সমগ্র হয়ে উঠছে সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সন্ধানের চেষ্টা হল। কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসাকর্মের এক ঘূর্ণাবর্ত, পরিণত দার্শনিক বুদ্ধির কাছে যার প্রতিটি কর্মই সমান নিন্দার্হ এবং যতশীঘ্র ভোলা যায় ততই ভালো, এভাবে প্রতিভাত না হয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মনুষ্য ইতিহাস প্রতিভাত হল মানুষেরই বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ারূপে। বিচিত্র সব পন্থায় এ প্রক্রিয়ায় ক্রমপ্রগতি অনুসরণ করা ও বাহ্যত আকস্মিক সব ঘটনার মধ্যে অন্তর্প্রবাহিত নিয়মটিকে বার করার কাজ এবার বুদ্ধির।

যে সমস্যা উপস্থিত করা হল তার সমাধান যে হেগেলীয় তন্ত্র দেয়নি, সে এখানে অবান্তর। তার যুগান্তকারী কীর্তি হল এই যে সমস্যাটিকে তিনি উপস্থিত করেছেন। এ সমস্যা এমন যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান দেওয়া অসম্ভব। সাঁ-সিমোঁর মতোহেগেলও যদিও তৎকালের এক অতি বিশ্ব-কৌষিক মনীষা, তথাপি প্রথমত, তাঁর স্বীয় জ্ঞানের অনিবার্য সীমায় এবং তাঁর যুগের জ্ঞান ও বোধের সীমাবদ্ধ প্রসার ও গভীরতায় তিনি সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তৃতীয় একটি সীমার কথাও যোগ করতে হবে। হেগেল ছিলেন ভাববাদী। তাঁর কাছে তাঁর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ভাবনাগুলি সত্যকার বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং উল্টো, বিশ্বেরও পূর্বে অনাদি কাল থেকে কোনো এক স্থানে বর্তমান এক 'ভাবের' (Idea) বাস্তবীভূত চিত্রই হল এই বস্তু ও তার বিকাশ। এ ধরনের চিন্তায় সবকিছুই একেবারে উল্টো করে দাঁড় করান হয় এবং বিশ্বের ভেতরকার বস্তুসমূহের আসল সম্পর্কটাকে আমূল বিকৃত করে দেওয়া হয়। আলাদা আলাদা বহু ঘটনাসমষ্টি সঠিকভাবে ও সপ্রতিভায় হেগেল হৃদয়ঙ্গম করলেও সদ্যবর্ণিত কারণে খুঁটিনাটিতে তাতে অনেক কিছুই রয়ে গেছে যা জোড়াতালি, কৃত্রিম, টেনেবুনে করা, অর্থাৎ ভুল। হেগেলীয় তন্ত্রটা একটা বিপুল গর্ভপাত, তেবে এ জাতের গর্ভপাত এই শেষ। বস্তুতপক্ষে একটা অন্তর্নিহিত ও অনুপশম বিরোধিতায় তা পীড়িত। একদিকে তার মূল প্রতিজ্ঞা হল এই বোধ যে, মানবিক ইতিহাস হল একটা বিবর্তন প্রক্রিয়া, সুতরাং স্বভাবতই কোনো তথাকথিত পরম সত্য আবিষ্কারই তার বুদ্ধিমার্গীয় শেষ কথা হতে পারে না। অথচ অন্যদিকে এই পরম সত্যেরই মূলাধার বলে তার আত্মঘোষণা। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের এই প্রকরণ-ধারা যা সবকিছুকে আলিঙ্গন করছে ও চিরকালের মতো চূড়ান্ত হয়ে থাকছে, — এটা দ্বান্দ্বিক যুক্তির মূলনীতিরই বিরোধী। বহির্বিশ্বের সুশৃঙ্খল জ্ঞান যে যুগে যুগে বিপুলভাবে এগিয়ে যেতে পারে এ নীতি বস্তুতপক্ষে ঐ ধারণাটা থেকে মোটেই দূরীভূত নয় বরং অঙ্গীভূত।

জার্মান ভাববাদের এই মৌলিক স্ববিরোধের বোধ থেকে স্বভাবতই প্রত্যাবর্তন ঘটল বস্তুবাদে কিন্তু, nota bene, নেহাৎ সেই অধিবিদ্যক, অষ্টাদশ শতকের একান্তরূপের যান্ত্রিক বস্তুবাদে নয়। সাবেকি বস্তুবাদের কাছে সমস্ত অতীত ইতিহাস ছিল অযৌক্তিকতা ও বলপ্রয়োগেরএক কদাকার স্তূপ ; আধুনিক বস্তুবাদ তাকে দেখে মানবসমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া রূপে এবং সে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারই তার লক্ষ্য। অষ্টাদশ শতকের ফরাসীদের কাছে, এমনকি হেগেলের কাছেও, সমগ্রভাবে প্রকৃতির যা বোধ সেটা এই যে, তা সঙ্কীর্ণ চক্রে ঘূর্ণমান, চিরকালের মতো অপরিবর্তনীয়, গ্রহ তারা সব চিরন্তন — যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব-প্রজাতির নড়চড় নেই — যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স। আধুনিক বস্তুবাদ ধারণ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলিকে, তাতে ধরা হয় যে প্রকৃতিরও একটা কালগত ইতিহাস আছে, গ্রহ তারাগুলিরও জন্মমৃত্যু হচ্ছে যেমন জন্মমৃত্যু হচ্ছে জৈব প্রজাতিগুলির, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে বাস নিয়েছে এই সব গ্রহ তারাতে। এবং সমগ্রভাবে প্রকৃতি যদি বা পৌনঃপুনিক চক্রেই আবর্তিত বলে এখনো পর্যন্ত ধরতে হয়, তাহলেও এ চক্রের আয়তন বেড়ে যাচ্ছেসীমাহীনরূপে। দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বন্দ্বমূলক ; রাণীর মতো যা বিজ্ঞানে অবশিষ্ট প্রজাদের শাসনাধিকার দাবি করে আসছিল তেমন কোনো একটা দর্শনেরপ্রয়োজন

তার আর নেই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই যতই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিপুল সামগ্রিকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে বাধ্য ততই এ সামগ্রিকতার জন্য একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর নতুবা অনাবশ্যক। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্য থেকে যেটুকু টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান — যুক্তি প্রকরণ (formal logic) ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বাকি সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের খাস বিজ্ঞানের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

অবশ্য প্রকৃতি বিষয়ক বোধে বিপ্লব যদিও হওয়া সম্ভব তার পাল্টা গবেষণালব্ধ আসল মালমশলার অনুপাতে, তাহলেও বেশ আগেই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাতে ঐতিহাসিক বোধের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে। ১৮৩১ সালে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁ-তে, ১৮৩৮-১৮৪২ সালের মধ্যে পরথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ইংরেজ চার্টিস্টদের আন্দোলন শীর্ষে আরোহণ করে। একদিকে আধুনিক শিল্প এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার নবার্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্যের বিকাশের সমানুপাতে প্রলেতারিয়েত-বুর্জোয়া শ্রেণী-সংগ্রাম পুরোভাগে আসতে থাকে ইউরোপের অতি অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে। পুঁজি ও মেহনতের সমস্বার্থ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সার্বজনীন সামঞ্জস্য ও সার্বজনীন সমৃদ্ধি — বুর্জোয়া অর্থনীতির এই সব শিক্ষাকে ক্রমেই সজোরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে লাগল ঘটনা। এ সব ঘটনাকে আর উপেক্ষা করা চলে না, যেমন উপেক্ষা করা চলে না তাদের তাত্ত্বিক, যদিও অতি অপরিণত প্রকাশ — ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রকে। কিন্তু ইতিহাসের পুরনো ভাববাদী যে ধারণা তখনো অপসৃত হয়নি, তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোনো জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না অর্থনৈতিক স্বার্থের, উৎপাদন তথা সর্ববিধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কাছে কেবল 'সভ্যতার ইতিহাসের' আনুষঙ্গিক গৌণ ঘটনা মাত্র।

নতুন তথ্যগুলির ফলে সমস্ত অতীত ইতিহাসের একটা নতুন বিচার আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন দেখা গেল, আদিম পর্যায়গুলি বাদে সমস্ত অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস ; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলিও চিরকাল উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার ফল ; সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা থেকেই আসছে আসল বনিয়াদ, যা থেকে শুরু করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবনার সমগ্র উপসৌধটার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বার করতে পারি। ইতিহাসকে হেগেল মুক্ত করেছিলেন অধিবিদ্যা থেকে, তাকে তিনি দ্বান্দ্বিক করে তোলেন ; কিন্তু তাঁর ইতিহাস বোধ ছিল মূলত ভাববাদী। এবার কিন্তু ভাববাব বিতাড়িত হল তার শেষ আশ্রয়, ইতিহাস দর্শন থেকে ; এবার প্রবর্তিত হল ইতিহাসের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যান ; এযাবৎকাল যা হত সেভাবে মানুষের 'সত্তাকে' তার 'জ্ঞান' দিয়ে ব্যাখ্যা না করে 'জ্ঞানকে' তার 'সত্তা' দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা পদ্ধতি পাওয়া গেল।

সে সময় থেকে কোনো বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইল না, তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক ফল। যথাসম্ভব নিখুঁত অটুট একটা সমাজব্যবস্থা বানানো আর নয়, তার কাজ হল সেই ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা অনুধাবন করা যা থেকে এই শ্রেণীগুলো ও তাদের বৈরিতার অনিবার্য উদ্ভব এবং তৎসৃষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে সংঘাত দূরীকরণের উপায় বার করা। কিন্তু তিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে আগের কালের সমাজতন্ত্রের ততটাই গরমিল যতটা গরমিল দ্বান্দ্বিকতা ও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফরাসী বস্তুবাদীদের প্রকতিবিষয়ক বোধের। আগের কালের সমাজতন্ত্র অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার ফলাফলের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা জানা ছিল না সুতরাং এর ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিকে বর্জন করা। পুঁজিবাদের আমলে যা অনিবার্য শ্রমিক শ্রেণীর সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কীসে সেই শোষণ, কী ভাবে তার উদ্ভব। কিন্তু সে জন্য দরকার ছিল (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অনিবার্যতার মধ্যে দেখানো এবং সেই হেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও উপস্থিত করা, এবং (২) তার মল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করা, তা তখনো সংগুপ্ত। এ কাজ নিষ্পন্ন হল উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কারে। দেখানো হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদধীনে শ্রমিক শোষণের ভিত্তি হল দাম-না-দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ ; বাজার থেকে পণ্য হিসাবে পুঁজিপতি যদি শ্রমশক্তিকে পুরো দাম দিয়েই কেনে তাহলেও সে যে দাম দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নিষ্কাশিত করে নেয়, এবং শেষ বিশ্লেষণে এই উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই সেই মূল্য সমষ্টির সৃষ্টি যা থেকে মালিক শ্রেণীগুলির হাতে ক্রমবর্ধমান পুঁজির স্তূপ জমা হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন উভয়েরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ এবং উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্‌ঘাটন, এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা মার্কসের কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সব কিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কপাত বিস্তারিত করে তোলা।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের শুরু এই প্রতিজ্ঞা থেকে যে মনুষ্যজীবনের ভরণপোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর উৎপাদিত বস্তুর বিনিময় — এই হল সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, এবং ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজের ধনবণ্টনের ধরন এবং শ্রেণী ও বর্গে সমাজের বিভাগ কী উৎপাদন হল, কী ভাবে উৎপাদিত হল এবং কী ভাবে উৎপন্নের বিনিময় হল, তার ওপর নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের শেষ কারণের সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ে কোনো ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে। তার সন্ধান করতে হবে দর্শনের মধ্যে নয়, প্রতি যুগের অর্থনীতির মধ্যে। প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অযৌক্তিক ও অন্যায়, যুক্তি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে অ-যুক্তি এবং ন্যায় অ-ন্যায়, *৪৪ তা কেবল এই প্রমাণ করে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও বিনিময়ের ধরনে অলক্ষ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যাতে পূর্বতন অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী সমাজব্যবস্থাটা আর খাপ খাচ্ছে না। তা থেকে আরো দাঁড়ায় যে, উদ্‌ঘাটিত বৈষম্য থেকে ত্রাণের উপায়ও এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেই ন্যূনাধিক বিকশিত অবস্থায় থাকতে বাধ্য। মূল সব নীতি থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সে উপায়গুলো উদ্ভাবনীয় নয়, সেগুলো আবিষ্কার করতে হবে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার কঠোর সত্যগুলির মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজতন্ত্রের বক্তব্য তাহলে কী?

এ কথা এখন সকলেই বেশ মানেন, সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা আজকের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়ার সৃষ্টি। বুর্জোয়ার বৈশিষ্টসূচক উৎপাদন-পদ্ধতি, মার্কসের সময় থেকে যা উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি বলে পরিচিত তা ব্যক্তি, গোটাগুটি এক একটা সামাজিক বর্গ ও স্থানীয় কর্পোরেশনের প্রতি সুবিধাদায়ী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তথা সামন্ততন্ত্রের যা সামাজিক কাঠামো সেই বংশগত অধীনতা সম্পর্কের সঙ্গে খাপ খায় না। বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্র ভেঙে ফেলে তার ধ্বংসের ওপর বানাল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, — অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমস্ত পণ্য-মালিকদের সমানাধিকার ইত্যাদি পুঁজিবাদী আশীর্বাদের রাজত্ব। তখন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকাশ পেতে পারল। বাষ্প, যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো কারখানাকে (manufacture) আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে তখন থেকে বুর্জোয়াদের পরিচালনায় উৎপাদন-শক্তি এমন দ্রুততায় ও এমন মাত্রায় বেড়েছে যা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু তার নিজের যুগে পুরনো কারখানা, এবং সে কারখানার প্রভাবে অধিকতর বিকশিত হস্তশিল্প যেমন গিল্ডের সামন্ত শৃঙ্খলের সঙ্গে সংঘাতে আসে, ঠিক তেমনি পরিপূর্ণতর বিকাশের আধুনিক শিল্প এবার সংঘাতে আসছে সেই সব বন্ধনের সঙ্গে যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তাকে সীমাবদ্ধ রাখছে। উৎপাদন-শক্তিকে ব্যবহার করার যে পুঁজিবাদী ধরন তাকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে নতুন উৎপাদন-শক্তি। এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির এই সংঘাতটা আদিম পাপ বনাম স্বর্গীয় ন্যায়ের মতো একটা সংঘাত নয়, যার উদ্ভব মানুষের মনে। সত্য ঘটনা হিসাবে, বাস্তবে, আমাদের বাইরে, এমনকি যে লোকগুলি এ সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাদের অভিপ্রায় ও কর্মের অপেক্ষা না রেখেই এ সংঘাত বর্তমান। আধুনিক সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় — বাস্তব ক্ষেত্রের এই সংঘাতের প্রতিফলন ভাবনার ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রেণী তাতে পীড়িত সর্বাগ্রে সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসে সে সংঘাতের এক আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

কীসে এই সংঘাত?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বে অর্থাৎ মধ্য যুগে উৎপাদনের উপায় মেহনতীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই ভিত্তিতে ক্ষুদে শিল্পের ব্যবস্থাই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত ; গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস বা স্বাধীন ক্ষুদে চাষীর কৃষিব্যবস্থা, শহরে গিল্ডের হস্তশিল্প। শ্রমের সরঞ্জাম — ভূমি, কৃষি-যন্ত্র, কর্মশালা, হাতিয়ারপত্র ছিল এক একজনের একক শ্রমের সরঞ্জাম, শুধু একজন শ্রমিকের ব্যবহারেরই তা উপযোগী এবং সেই কারণে স্বভাবতই তা স্বল্প, ক্ষুদ্রায়তন ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঠিক এই জন্যই সাধারণত উৎপাদকই ছিল তার মালিক। উৎপাদনের এই বিক্ষিপ্ত, স্বল্প উপায়গুলিকে পুঞ্জীভূত করা, পরিবর্ধিত করা, আজকালকার প্রবল উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত করা — এইটেই ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার প্রবক্তা বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'পুঁজি' গ্রন্থের চতুর্থ অংশে মার্কস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে সরল সমবায়, কারখানা ও আধুনিক শিল্প, এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা ঐতিহাসিকভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে ১৫শ শতক থেকে। তাতে আরো দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদনের এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে উপায়গুলিকে যুগপৎ ব্যক্তির উৎপাদন-উপায় থেকে একমাত্র সমষ্টিগতভাবে পরিচালনীয় সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে পরিণত না করে বুর্জোয়ারা সেগুলোকে শক্তিশালী উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত না। চরকা, হস্তচালিত তাঁত, কামারের হাতুড়ির জায়গায় এল সূতা-কল, শক্তি-চালিত তাঁত, বাষ্প-চালিত হ্যামার ; ব্যক্তিগত কর্মশালার জায়গায় এল ফ্যাক্টরি যাতে শত শত, হাজার হাজার মজুরের সহযোগ প্রয়োজন। একই ভাবে, উৎপাদন ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত কর্মের একটা ধারা এথকে পরিবর্তিত হল সামাজিক কর্মের একটা ধারায়, এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিবর্তিত হল ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক

উৎপন্ন দ্রব্যে। ফ্যাক্টরি থেকে এবার যে সূতা, যে কাপড়, যে ধাতু দ্রব্যাদি বেরিয়ে আসতে লাগল তা হল বহু শ্রমিকের মিলিত উৎপাদন, যা পর পর বহু শ্রমিকের হাত ঘুরে এসে তৈরি হয়েছে। কোনো একটা লোক এ কথা বলতে পারত না, 'এটা আমি তৈরি করেছি ; এটা আমার মাল।'

কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটা সমাজে যেখানে উৎপাদনের মূল ধরনটা হল শ্রমের এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিভাগ যা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছকের ওপর নয় এমনিই ধীরে ধীরে এসে পড়েছে, সেখানে উৎপন্নও পণ্যের রূপ নেয়, এ পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে, বেচা-কেনায় উৎপাদক তার বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পারে। এই ছিল মধ্য যুগের অবস্থা, যেমন, কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করত কারুশিল্পীর কাছে এবং তার কাছ থেকে কিনত হস্তশিল্পজাত সামগ্রী। ব্যক্তিগত উৎপাদক, পণ্য উৎপাদকদের এই সমাজে চেপে বসল নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিনাই যা গড়ে উঠেছিল এবং সমগ্র সমাজ যার ওপর চলত সেই পুরনো শ্রম-বিভাগের ভেতর এবার এল একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ, যেমন ফ্যাক্টরিতে ; ব্যক্তিগত উৎপাদনের পাশাপাশি আবির্ভূত হল সামাজিক উৎপাদন। দু-ধরনের উৎপাদনই একই বাজারে বিক্রয় হত, সুতরাং নিশ্চয় প্রায় সমান সমান দামে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমবিভাগের চেয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সংগঠন প্রবলতর। সমষ্টিবদ্ধ ব্যক্তির সংযুক্ত সামাজিক শক্তি নিয়ে চালু ফ্যাক্টরিগুলি ব্যক্তিগত ক্ষুদে উৎপাদকদের চেয়ে পণ্য-উৎপাদন করতে লাগল অনেক শস্তায়। শাখার পর শাখায় হার মানতে লাগল ব্যক্তিগত উৎপাদন। সমাজীকৃত উৎপাদন উৎপাদনের সমস্ত পুরনো পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটা। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিপ্লবী চরিত্রটা এতই কম পরিজ্ঞাত থাকে যে, তা প্রবর্তিত হয় উল্টোভাবে পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় হিসাবে। উদ্ভবের সময় তা পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময়ের কতকগুলি তৈরি ব্যবস্থা পেয়েছিল এবং তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায় যথা বণিক পুঁজ, হস্তশিল্প, মজুরি-শ্রম। সমাজীকৃত উৎপাদন এই ভাবে পণ্য-উৎপাদনেরএকটা নবরূপ হিসাবে প্রবর্তিত হওয়ায় অবধারিতভাবেই তার মধ্যে পুরনো ধরনের দখলদারি পুরো বজায় থাকে এবং তার উৎপন্নের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়।

পণ্য-উৎপাদনের বিবর্তনের মধ্যযুগীয় স্তরে শ্রমোৎপন্ন বস্তুর মালিক কে, সে প্রশ্ন উঠতেও পারেনি। নিজেরই কাঁচামাল — সাধারণত তা তার নিজেরই তৈরি — তাই থেকে ব্যক্তিগত উৎপাদক নিজের হাতিয়ারপত্র দিয়ে, নিজের বা পরিবারের মেহনতে তা উৎপন্ন করত। উৎপন্ন বস্তুটা দখল করার কোনো প্রয়োজন উৎপাদকের ছিল না। অবধারিতভাবেই তা ছিল পুরোপুরি তারই জিনিস। সুতরাং, উৎপন্ন বস্তুর উপর তার মালিকানার ভিত্তি হল তার নিজ শ্রম। যে ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য ব্যবহৃত হত সেখানেও সাধারণত তার গুরুত্ব থাকত কম, এবং প্রায়শই মজুরি ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হত। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও কর্মীরা কাজ করত ভরণ-পোষণ ও মজুরির জন্য ততটা নয়, যতটা শিক্ষার জন্য, নিজেরাই যাতে তারা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য।

তারপর শুরু হল বড়ো বড়ো কর্মকেন্দ্র ও কারখানায় উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদকদের পুঞ্জীভবন, প্রকৃতই সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায় ও সমাজীকৃত উৎপাদকরূপে তাদের রূপান্তর। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদক এবং উৎপাদন-উপায় ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য এ পরিবর্তনের পরেও ঠিক আগের মতোই বিবেচিত হতে লাগল অর্থাৎ ধরা হতে থাকল ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্য রূপে। এযাবৎকাল মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্যের দখল নিয়েছে কেননা সাধারণত ওটা তারই উৎপন্ন অন্যের সাহায্যটা ব্যতিক্রম। এখনো মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্য দখল করতে থাকল, যদিও এটা এখন তার উৎপন্ন নয়, একান্তরূপে অন্যের মেহনত থেকে উৎপন্ন। এই ভাবে, সামাজিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দখল পেল না তারা যারা আসলে উৎপাদনের উপায়কে চালু করেছে, যারা আসলে পণ্য-উৎপাদন করেছে, দখল পেল পুঁজিপতিরা। উৎপাদনের উপায় তথা উৎপাদনটাই মূলত সমাজীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা দখলদারি প্রথার তা অধীন রইল যাতে এক এক জনের উৎপাদন ব্যক্তিগত বলে ধরে নেওয়া হত এবং সেই হেতু, প্রত্যেকেই ছিল তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক এবং তা বাজারে আনত। এই রকমের দখলের অধীন হল উৎপাদন-পদ্ধতি, যদিও এ দখল যে সর্তের ওপর দাঁড়িয়েছিল তা এ উৎপাদন-পদ্ধতি অবসান করে দিয়েছে।*৪৫

এই স্ববিরোধটাই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিবাদী চরিত্র দান করেছে এবং তার মধ্যেই আজকের সমগ্র সামাজিক বৈরিতার বীজ নিহিত। উৎপাদনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সমস্ত উৎপাদনশীল দেশে এই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির আধিপত্য যতই বাড়ছে, যতই তা ব্যক্তিগত উৎপাদনকে এক নগণ্য হতাবশেষে পরিণত করছে, ততই পরিষ্কার করে ফুটে উঠছে সমাজীকৃত উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী দখলের অসামঞ্জস্য।

আগেই বলেছি, প্রথম পুঁজিপতিরা বাজারে অন্যান্য রূপের শ্রমের সাথে সাথে মজুরি-শ্রমও পায় তৈরি অবস্থায়। কিন্তু সে ছিল ব্যতিরেকমূলক, অনুপূরক, সহায়ক, অস্থায়ী মজুরি-শ্রম। কৃষি-মেহনতি কখনো কখনো বা দিন-মজুর হিসাবে খাটলেও কয়েক একর নিজস্ব জমি তার ছিল, যাই ঘটুক না কেন, তা থেকে দুমুঠো জোগাড় করতে পারত

সে। গিল্ডগুলির সংগঠন ছিল এমন যে, আজ যে শিক্ষানবিস কাল সে হত ওস্তাদ। কিন্তু উৎপাদনের উপায় সমাজীকৃত ও পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সবকিছু বদলে গেল। ব্যক্তিগতত উৎপাদকের উৎপাদন-উপায় তথতা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমেই হয়ে উঠল মূল্যহীন ; পুঁজিপতির অধীনে মজুরি-শ্রমিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। কিছু পূর্বে যা ছিল ব্যতিরেক ও সহায়ক সেই মজুরি-শ্রম হয়ে দাঁড়াল নিয়ম ও সমস্ত উৎপাদনের ভিত্তি ; আগে যা ছিল পরিপূরক তাই হয়ে দাঁড়াল শ্রমিকের অবশিষ্ট একমাত্র কর্ম। যারা ছিল অস্থায়ী মজুরি-শ্রমিক তারা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী মজুরি-শ্রমিক। এই স্থায়ী মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা আরো প্রভূত পরিমাণ বেড়ে ওঠে সে সময় সংঘটিত সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙন দ্বারা, সামন্ত প্রভুদের লোক-লস্কর বাহিনী ভেঙে দেওয়া, বাস্তুজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ প্রভৃতি দ্বারা। একদিকে পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত উৎপাদনের উপায় এবং অন্যদিকে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই সেই উৎপাদকেরা, এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের মধ্যকার বিরোধ আত্মপ্রকাশ করল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার বৈরিতা রূপে।

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি চেপে বসল পণ্য উৎপাদক, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের এমন একটা সমাজের ওপর, উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ই যাদের ছিল সামাজিক বন্ধন। কিন্তু পণ্য-উ !পাদনের ভিত্তিতে গড়া প্রত্যেকটি সমাজেরই এই একটা বৈশিষ্ট্য আছে : স্বকীয় সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ পণ্য উৎপাদকেরা হারায়। যা পাওয়া গেছে তেমনি ধারা উৎপাদনের উপায় দিয়ে এবং বাকি চাহিদা মেটাতে যা দরকার ততার বিনিময়ার্থে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে তার নিজের জন্য। কেউ জানে না, তার বিশেষ মালটা বাজারে আসবে কতোখানি, কী পরিমাণই বা তার চাহিদা হবে। কেউ জানে না, তার স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যটার জন্য সত্যকার চাহিদা থাকবে কিনা, তার উৎপাদন-খরচ সে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা, এমনকি আদৌ তার পণ্যটা বিক্রি হবে কিনা। সমাজীকৃত উৎপাদনে রাজত্ব করে নৈরাজ্য।

কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ধরনের উৎপাদনের মতো পণ্যোৎপাদনেরও কতকগুলি বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য নিয়ম আছে ; এবং নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের ভেতরে, নৈরাজ্যের মাধ্যমেই এসব নিয়ম কাজ করে যায়। সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের একমাত্র অবিচল রূপ অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলো আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রতিযোগিতার অনিবার্য নিয়ম হিসাবে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের প্রভাবিত করে। প্রথম দিকে এ নিয়ম তাদের জানা থাকে না, তা আবিষ্কার করতে হয় ক্রমে ক্রমে, অভিজ্ঞতার ফলে। এ নিয়ম তাই উৎপাদকদের অপেক্ষা না রেখে, তাদেরই বিরুদ্ধে, তাদের বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মরূপে কাজ করে যায়। উৎপন্ন শাসন করে উৎপাদকদের।

মধ্যযুগীয় সমাজে, বিশেষ করে আগেকার শতকগুলিতে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো। প্রধানত তা মেটাত উৎপাদক ও তার পরিবারের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অধীনতা সম্পর্ক যেখানে ছিল, যেমন গ্রামাঞ্চলে, সেখানে তা সামন্ত প্রভুর প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করত। সুতরাং এটা বিনিময়ের ব্যাপার চিল না, উৎপন্নও সেই কারণে পণ্যের রূপ নেয়নি। কৃষক পরিবারটির যা যা প্রয়োজন — কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র তথা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়, প্রায় সবই তারা উৎপন্ন করত। নিজের প্রয়োজন এবং সামন্ত প্রভুর নিকট সামগ্রী হিসাবে প্রদেয় খাজনার অতিরিক্ত যখন সে কিছু উৎপাদন করত কেবল তখনই সে উৎপাদন করত পণ্য। সামাজিক বিনিময়ের মধ্যে যা এসেছে এবং বিক্রয়ের জন্য যা ছাড়া হয়েছে সেই উদ্বৃত্তটা হয়ে দাঁড়াত পণ্য।

শহরের হস্তশিল্পীদের প্রথম থেকেই পণ্য-উৎপাদন করতে হত সত্য। কিন্তু তারাও তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের বেশির ভাগটাই নিজেরা মেটাত। বাগান, জমি ছিল তাদের। গবাদি পশুপাল তাদের চরত বারোয়ারী বনে, কাঠ আর জ্বালানিও তারা পেত সেখান থেকে। মেয়েরা শণ পশম বুনত ইত্যাদি। বিনিময়ের জন্য উৎপাদন, পণ্য-উৎপাদন তখনো মাত্র তার শৈশবে। সুতরাং, বিনিময় ছিল সংকুচিত, বাজার সংকীর্ণ, উৎপাদন-পদ্ধতি অনড় ; বাইরের দিকে ছিল স্থানীয় বিচ্ছিন্নতা, ভিতর দিক থেকে ছিল স্থানীয় ঐক্য ; গ্রামাঞ্চলে মার্ক*৪৬ ; শহরে গিল্ড।

কিন্তু পণ্যোৎপাদনের প্রসার, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ যা ছিল সুপ্ত, পণ্যোৎপাদনের সেই নিয়মগুলি অধিকতর প্রকাশ্যে প্রবলতররূপে সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধন শিথিল হয়ে গেল, বিচ্ছিনতার সাবেকি সীমা ভেঙে পড়ল, উৎপাদকেরা ক্রমেই বেশি বেশি পরিবর্তিত হল আলাদা আলাদা স্বাধীন পণ্যোৎপাদক রূপে। পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, সমূহ সামাজিক উৎপাদন রয়েছে এক পরিকল্পনাহীনতা, আকস্মিকতা, নৈরাজ্যের শাসনে এবং এ নৈরাজ্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদনের এই নৈরাজ্যকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধান যে উপায়ে তীব্র করে তোলে সেটা নৈরাজ্যের ঠিক বিপরীত। সে উপায় হত প্রতিটি আলাদা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটা সামাজিক বনিয়াদের ওপর উৎপাদনের ক্রমবর্ধিত সংহতি। এর ফলে সাবেকি শান্তিপূর্ণ অচলায়তনের অবসান হল। শিল্পের কোনো একটা শাখায় উৎপাদনের এই পদ্ধতির সংগঠন প্রবর্তিত হলেই তা আর অন্য কোনো উৎপাদন-পদ্ধতিকে সেখানে বরদাস্ত করে না। শ্রমক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রণক্ষেত্র। বিপুল সব ভৌগোলিক

আবিষ্কার*৪৭ এবং তার পেছু পেছু উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বাজার বর্ধিত হল বহুগুণ, কারখানা ব্যবস্থা হিসাবে হস্তশিল্পের রূপান্তর ত্বরান্বিত হল। একটা বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেই কেবল যুদ্ধ বাধল তা নয়। স্থানীয় সংগ্রাম থেকে আবার সৃষ্টি হল জাতীয় সংগাত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাণিজ্যিক যুদ্ধ।*৪৮

পরিশেষে, আধুনিক শিল্প ও বিশ্ববাজারের উন্মুক্তির ফলে এ সংগ্রাম হয়ে উঠল বিশ্বজনীন, এবং সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব রকমের তীব্র। উৎপাদন-পরিস্থিতির স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সুবিধা দ্বারাই এখন এক একজন পুঁজিপতির তথা গোটা শিল্প বা দেশের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নির্ধারিত হতে থাকল। যার হার হয় তাকে নির্মমভাবে ঠেলে ফেলা হয়। এ সেই ডারউইনী অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রচণ্ড হয়ে স্থানান্তরিত হল প্রকৃতি থেকে সমাজে। পশুর পক্ষে যে জীবন ধারা স্বাভাবিক তাই যেন হয়ে দাঁড়ায় মানবিক বিকাশের শেষ কথা। সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এবার প্রকাশ পায় এক একটা কারখানার উৎপাদন সংগঠনের সঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের উৎপাদন-নৈরাজ্যের বৈরিতা রূপে।

এই দুই ধরনের যে বৈরিতা তার জন্মগত, তার মধ্যেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির গতি। ফুরিয়ে কর্তৃক পূর্বেই আবিষ্কৃত এ 'পাপ চক্র' থেকে তা কখনো বেরতে পারে না। তাঁর যুগে ফুরিয়ে যেটা লক্ষ্য করতে পারেননি সেটা হল এই যে, এ চক্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে ; গতি হয়ে উঠছে ক্রমেই এক সর্পিলবৃত্ত, এবং গ্রহাদির গতির মতো কেন্দ্রের সংঘর্ষে তার অবসান অনিবার্য। সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের মধ্যস্থ নৈরাজ্যের জবরদস্তি শক্তিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতে পরিণত হচ্ছে, এবং ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণই আবার উৎপাদন-নৈরাজ্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের জবরদস্তি শক্তিতেই আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন উন্নয়ন পরিণত হচ্ছে এক আবশ্যিক নিয়মে, এর ফলে প্রত্যেকটি শিল্পজীবী পুঁজিপতিকেই তার যন্ত্রকে ক্রমাগত উন্নত করে তুলতে হবে নইলে ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু যন্ত্রের উন্নয়ন অর্থ মানবিক শ্রমকে অবান্তর করে তোলা। যন্ত্রের প্রবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ যদি হয়ে থাকে অল্পসংখ্যক যন্ত্র-কর্মী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের স্থানচ্যুতি, তাহলে যন্ত্রের উন্নয়নের অর্থ এবার যন্ত্র-কর্মীদেরই ক্রমাগত অপসারণ। পরিণামে এর অর্থ পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদল কর্মেচ্ছু মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি, ১৮৪৫ সালে*৪৯ যা বলেছিলাম, শিল্পের সেই একটা গোটাগুটি মজুদ বাহিনী গঠন, শিল্প যখন খুব চড়া তখন তাদের কাজে লাগানো হয়, অনিবার্য ধ্বস এলেই আবার যাদের ছাঁটাই করা হবে, পুঁজির সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রামে যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্কন্ধে এক নিরন্তর ভারস্বরূপ, পুঁজির স্বার্থানুযায়ী একটা নিচু মানে মজুরি নামিয়ে রাখার মতো এক নিয়ন্ত্রক। এই ভাবেই, মার্কসের কথায়, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজির যে সংগ্রাম তাতে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র, শ্রমিকেরই যা সৃষ্টি তাই হয়ে দাঁড়ায় তাকে অধীনস্থ করার এক হাতিয়ার। এই ভাবেই শ্রম-যন্ত্রের ব্যয়সংকোচ সেই সঙ্গে গোড়া থেকেই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমশক্তির অতি বেপরোয়া অপচয়, শ্রম-কর্মের সাধারণ পরিস্থিতির ভিত্তিতেই লুণ্ঠন ; যন্ত্র, 'শ্রম-সময় সংক্ষেপের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে পুঁজিপতির হাতে তুলে দেবার অতি মোক্ষম উপায়।' ('পুঁজি', ইংরাজি সংস্করণ, পৃঃ ৪০৬।) এই ভাবেই কারো কর্মহীনতার প্রাথমিক সর্ত হয় অন্য কারো অতি মেহনত এবং সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন নতুন খরিদ্দার-সন্ধানী আধুনিক শিল্প স্বদেশীয় জনগণের ভোগসীমাকে নামিয়ে আনে অনশন মাত্রার ন্যূনতমে, তাই করতে গিয়ে স্বদেশের নিজ বাজারকেই তা ধ্বংস করে। 'পুঁজি সঞ্চয়ের জোর ও ব্যাপকতার সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতা, বা শিল্পের মজুদ বাহিনী ভারসাম্য সর্বদাই রক্ষিত হয় যে নিয়মে, সে নিয়ম পুঁজির সঙ্গে মজুরকে যতটা কঠিন করে প্রোথিত করে রাখে তা প্রমেথিউসকে*৫০ পাহাড়ে প্রোথিত করার ভালকানী কীলকের চেয়েও জোরালো। পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সঞ্চয় করে তোলে দৈন্য। এক প্রান্তে ধনসঞ্চয় তাই যুগপৎ দৈন্য, শ্রম-ক্লেশ, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতনের সঞ্চয় ঠিক বিপরীত প্রান্তে, অর্থাৎ সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে যারা তাদেরই স্বীয় উৎপাদনকে উৎপন্ন করছে পুঁজিরূপে।' (মার্কসের 'পুঁজি' [Sonnenschein & Co.], পৃঃ ৬৬১।) উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো উৎপন্ন-বন্টন আশা করা আর এ আশা করা সমান কথা যে, ব্যাটারির ইলেক্ট্রোড যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ এ্যাসিড মেশা জলকে তা বিশ্লিষ্ট করবে না, তার ধনাত্মক মেরু থেকে অক্সিজেন ও ঋণাত্মক মেরু থেকে হাইড্রোজেন ছাড়তে থাকবে না।

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্প-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতা সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের দ্বারা পরিণত হয়েছে এমন একটা আবশ্যিক নিয়মে যাতে আলাদা আলাদা শিল্পজীবী পুঁজিপতি সর্বদাই তার যন্ত্রকে উন্নত করতে, সর্বদাই সে যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। উৎপাদন ক্ষেত্র প্রসারের সম্বাবনাটাও তার কাছে অনুরূপ একটা আবশ্যিক নিয়মে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ-শক্তির কাছে গ্যাসের সম্প্রসারণ-শক্তিকে মনে হয় ছেলেখেলা, এ শক্তি এখন আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের এমন এক আবশ্যিকতা রূপে যা কোনো বাধারই পরোয়া করে না। এ বাধা আসে পণ্য-ভোগ থেকে, বিক্রয় থেকে, আধুনিক শিল্প মালের

বাজার থেকে। কিন্তু বাজারের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় শাসিত হয় প্রধানত অন্য কতকগুলি নিয়মে যার তেজ অনেক কম। উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত যেহেতু এই সংঘাত থেকে কোনো সত্যকার সমাধান সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলো আসতে থাকে পর্যায়ক্রমে। পুঁজিবাদী উৎপাদন জন্ম দিল আর একটি 'পাপ চক্রের'।

বস্তুতপক্ষে, ১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয় তখন থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্য জগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী ন্যূনাধিক বর্বর জাতিদের উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে একবার করে ভেঙে পড়ে। বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজার জাম, মাল জমতে থাকে, যতই তা অবিক্রেয় ততই তা স্তূপাকার, নগদ টাকা অদৃশ্য হয়, ঋণ দান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ফ্যাক্টরি আর শ্রমিক জনগণের জীবিকা যায়, কারণ অতিমাত্রায় জীবিকোপকরণ উৎপন্ন করেছে তারা ; একের পর এক দেউলিয়া, একের পর এক ক্রোক। অচলাবস্থা চলে কয়েক বছর ধরে ; উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্ন মালের অপচয় হতে থাকে, পাইকারীভাবে তার ধ্বংস চলতে থাকে যতদিন না সঞ্চিত পণ্যস্তূপের মোটের ওপর মূল্যহ্রাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ঝরে যায়, যতদিন না উৎপাদন ও বিনিময় ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করে। একটু একটু করে তার গতি বাড়ে। শুরু হয় দুলকি চলন। শিল্পের দুলকি চলন বেড়ে ওঠে ধাবনে এবং ধাবনও পরিণত হয় শিল্প, কারবারী ঋণ ও ফাটকার এক খাঁটি উদ্দাম কদমে ছোটায়, শেষ পর্যন্ত পড়ি-মড়ি লম্ফঝম্পেরর পর সেখানে এসেই থামে যেখানে শুরু অর্থাৎ সংকটের গহ্বরে। এই চলে ফিরে ফিরে। ১৮২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার এই ঘটেছে এবং বর্তমানে (১৮৭৭) ছয়বারের বার তা ঘটছে। এ সব সংকটের চরিত্র এতই পরিষ্কার যে ফুরিয়ে crise plethorique বা রক্তাতিশয্যের সংকট বলে প্রথম সংকটটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই সব সংকটের বর্ণনা হয়েছে।

এ সব সংকটে সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এক প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। পণ্যসঞ্চালন কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়। সঞ্চালনের যা মাধ্যম, সেই মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্যোৎপাদন ও পণ্য সঞ্চালনের সমস্ত নিয়মই উল্টে যায়। অর্থনৈতিক সংঘাত তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছয়। উৎপাদনের পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে।

ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে উৎপাদনের সমাজীকৃত সংগঠন এত দূর বিকশিত হয়েছে যে, সহবিদ্যমান ও প্রাধান্যকারী সামাজিক উৎপাদন-নৈরাজ্যের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছে না। এ ঘটনাটা খোদ পুঁজিপতিদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংকট কালে পুঁজির প্রচণ্ড পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে, বহু বৃহৎ এবং বহুতর ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ধ্বংসে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমগ্র ঠাট ভেঙে পড়ে উৎপাদন-শক্তির চাপে, তারই সৃষ্টির চাপে। এই সমস্ত উৎপাদন-উপায়কে তা আর পুঁজিতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। সেগুলো পড়ে থাকে বেকার হয়ে এবং সেই হেতু শিল্পের মজুদ বাহিনীও থাকে বেকার। উৎপাদনের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপকরণ, কর্মেচ্ছু শ্রমিক, উৎপাদনের ও সাধারণ সম্পদের সমস্ত উপকরণই রয়েছে অজস্র। কিন্তু 'অজস্রতা হয়ে দাঁড়ায় দৈন্য দুর্দশার উৎস' (ফুরিয়ে), কারণ উৎপাদন ও জীবিকার উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয় এই অজস্রতাই। কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় সচল থাকতে পারে কেবল তখনই যখন তার প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে পুঁজিতে, মনুষ্য শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে। উৎপাদন ও জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার এই প্রয়োজন প্রেতের মতো শ্রমিক ও এই উপায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান। কেবল মাত্র তার জন্যই উৎপাদনের বৈষয়িক ও ব্যক্তিক কারিকার সম্মিলন ব্যাহত হয় ; কেবল মাত্র তার জন্যই উৎপাদন-উপায়ের সচল থাকা, শ্রমিকের খেটে বেঁচে থাকা বারণ। তাই একদিকে, এই উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করার অক্ষমতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি নিজেই আত্ম-অভিযুক্ত ; অন্যদিকে, এই সব উৎপাদন-শক্তি নিজেরাই ক্রমবর্ধমান তেজে এগিয়ে আসছে বর্তমান বিরোধের অবসানের দিকে, পুঁজি হিসাবে তাদের যে গুণ তা বিলোপের দিকে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিসাবে তাদের যে চরিত্র তার ব্যবহারিক স্বীকৃতির দিকে।

পুঁজি হিসাবে তাদের যে গুণ তার বিরুদ্ধেই ক্রমপ্রবল উৎপাদন-শক্তির এই বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্র স্বীকৃত হোক, এই ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে খাস পুঁজিপতি শ্রেণীও বাধ্য হয় তাদের ক্রমেই বেশি বেশি করে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিসাবে ধরতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে তা যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে। শিল্পের অতি চাপের পর্যায়ে ঋণ ব্যবস্থায় অসীম স্ফীতির মারফত যতটা, বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভাঙন মারফত ধ্বস দ্বারাও ততটাই বিপুল উৎপাদন-উপায়সমূহের সেই ধরনের একটা সমাজীকরণ ঘটাতে চায়, যা আমরা বিভিন্ন জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ করছি। উৎপাদন ও বণ্টনের এই উপায়সমূহের অনেকগুলিই গোড়া থেকেই এতই বিরাট যে, রেলওয়ের মতোই তাতে অন্যবিধ পুঁজিবাদী শোষণের অবকাশ মেলে না। আরো বিকাশের এক পর্যায়ে এই ধরনটাও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশেষ দেশের একটা বিশেষ শিল্প-শাখার সমস্ত বড়ো বড়ো উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হয় 'ট্রাস্টে', উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সমিতিতে। উৎপাদ্যের মোট পরিমাণ তারা স্থির করে, নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নেয় এবং এই ভাবে আগে থেকেই বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু কারবারে মন্দা পড়তেই এই ধরনের

ট্রাস্টের সাধারণভাবে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা, সেই কারণেই আরো বেশি পরিমাণ সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন তা জাগায়। এক একটা শিল্পের সবখানিই পরিণত হয় এক অতিকায় জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে ; আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্থান নেয় এই একটি কোম্পানির আভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কারবার। তা ঘটেছে ১৮৯০ সালে ইংলন্ডের অ্যালক্যালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সমস্ত ৪৮টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের একীকরণের পর তা এখন একটি কোম্পানির হাতে, ৬০ লক্ষ পাউন্ড মূলধন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একটি একক পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে — একচেটিয়া কারবারে ; এবং পুঁজিবাদী-সমাজসুলভ বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন নতিস্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক-সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির উৎপাদন পরিচালনা, ক্ষুদ্র একদল ডিভিডেন্ট-লিপ্সু কর্তৃক সমাজকে এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে*৫১ নিজের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে — ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলে।

আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে তবে উৎপাদন ও বণ্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ট্রাস্ট, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণ অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটি নির্বাহ হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেন্ট পকেটস্থ করা, কুপন কাটা আর বিভিন্ন পুঁজিপতিরা যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের ; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুদ বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি বা ট্রাস্টে অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্বতঃই স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রও কিন্তু শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রিক জাতীয় পুঁজির একটি আদর্শ রূপমূর্তি। উৎপাদন-শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে চায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে ওঠে জাতীয় পুঁজিপতি, তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি-শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারীয় রূপেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন-শক্তির রাষ্ট্র মালিকানা সংঘাতের সমাধান করে না, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল সর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত।

এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে, এবং সেই হেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সামগ্রিকবাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন-শক্তির ওপর প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের দখল স্থাপন করেই কেবল তা সম্ভব। উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকে থেকেই বানচাল করে দেয়, অন্ধ বলাৎকারী বিধ্বংসী এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু সমাজ কর্তৃক উৎপাদন-শক্তিগুলিকে গ্রহণের পর উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বুঝে, বিঘ্ন ও পর্যায়িক ধ্বসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনেরই প্রবলতম এক কারিকা।

সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া ঠিক প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মতোই : যতক্ষণ তাদের না বুঝছি, হিসাবে না মেলাচ্ছি ততক্ষণ অন্ধ, বলাৎকারী ও বিধ্বংসী। কিন্তু একবার তাদের যদি বোঝা যায়, একবার যদি তাদের ক্রিয়া, গতিমুখ ও ফলাফল ধরা যায়, তাহলে ক্রমাগত আমাদের আজ্ঞাবহ তাদের করে তুলব কিনা, তাদের সাহায্যেই আমাদের লক্ষ্যসাধন করব কিনা সেটা আমাদেরই ইচ্ছাধীন। আজকের পরাক্রান্ত উৎপাদন-শক্তিগুলির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ করেই খাটে। এই সব সক্রিয় সামাজিক উপায়গুলির প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে আমরা যতক্ষণ গোঁয়ারের মতো অনিচ্ছুক — এ বোধ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার সমর্থকী প্রবণতার বিরুদ্ধেই — ততক্ষণ এ শক্তিগুলি কাজ করে যাবে আমাদের অপেক্ষা না রেখেই, আমাদের বিরুদ্ধে, ততক্ষণ তারা আধিপত্য করে যাবে আমাদের ওপর, পূর্বে যা আমরা বিশদে দেখিয়েছি।

কিন্তু একবার যদি তাদের প্রকৃতি বোঝা যায়, তাহলে একত্রে-মেহনতী উৎপাদকদের হাতে তাদের পরিণত করা

যায় দানবপ্রভু থেকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে। তফাৎটা হল ঝটিকা বজ্রস্থ বিদ্যুতের ধ্বংসশক্তির সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও ভল্টেইক আর্কের বশীভূত বিদ্যুতের তফাৎ, দাবাগ্নির সঙ্গে মানুষের কাজে লাগানো আগুনের তফাৎ। শেষপর্যন্ত আজকের উৎপাদনী শক্তিগুলির আসল চরিত্রের এই স্বীকৃতির ফলে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের স্থান নেয় গোষ্ঠী ও প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় উৎপাদনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে প্রথমে উৎপাদককে ও পরে দখলকারীকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধে, দখলের সেই পুঁজিবাদী পদ্ধতির জায়গায় তখন আসে দখলের এমন এক পদ্ধতি, আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের চরিত্র যার ভিত্তি : একদিকে উৎপাদন সচল ও সম্প্রসারণের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ সামাজিক দখল, এবং অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহ ও উপভোগের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দখল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশকে ক্রমেই পরিপূর্ণ প্রলেতারিয়েতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির সৃষ্টি করে যা এ বিপ্লব সাধন করতে বাধ্য হয়, অন্যথায় তার ধ্বংস অনিবার্য। ইতিমধ্যেই যা সমাজীকৃত হয়ে উঠেছে, সেই বিপুল উৎপাদন-উপায়কে ক্রমাগত বেশি করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেই এ বিপ্লব সাধনের পথ দেখায়। প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের উপায়কে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে।

কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত হিসাবে তার আত্মাবসান ঘটে, লুপ্ত হয় সমস্ত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বৈরিতা, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিসাবে যে অস্তিত্ব তা বিলুপ্ত হয়। শ্রেণী বৈরিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এযাবৎ প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ pro tempore যা শোষক শ্রেণী তেমন একটা বিশেষ শ্রেণীর এক সংগঠনের, প্রচলিত উৎপাদন পরিস্থিতিতে বহিরাগত বিঘ্ন নিরোধের উদ্দেশ্যে, এবং সুতরাং, বিশেষ করে নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির (ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, মজুরি-শ্রম) সহগ পীড়ন ব্যবস্থার মধ্যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে সবলে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এক সংগঠনের। রাষ্ট্র ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, সমাজকে জুড়ে রাখা একটা দৃষ্টিগোচর প্রতিভূ। কিন্তু তা শুধু এই অর্থে সত্য যে, তা হল তেমন একটা শ্রেণীর রাষ্ট্র যা তৎকালে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে : প্রাচীন কালে ক্রীতদাসমালিক নাগরিকদের রাষ্ট্র ; মধ্য যুগে সামন্ত প্রভুদের ; আমাদের কালে বুর্জোয়াদের। রাষ্ট্র যখন অবশেষে সমগ্র সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায় তখন তা নিজেকে করে তোলে অনাবশ্যক। অধীনে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী যেই আর থাকে না, যেই শ্রেণী-শাসন এবং আমাদের উৎপাদন-নৈরাজ্যের ভিত্তিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংগ্রাম ও তদুদ্ভূত সংঘর্ষ ও অনাচারের অবসান হয়, অমনি দমন করার মতো কিছুও আর বাকি থাকে না, এবং একটা বিশেষ পীড়ন-শক্তির, একটা রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন হয় না। প্রথম যে কাজটার ফলে রাষ্ট্র সত্য করেই নিজেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করে তোলে — সমাজের নামে উৎপাদন-উপায়গুলিকে দখল করা — সেইটাই হল একই কালে রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে এবং তারপর সে নিজে থেকেই মরে যায় ; লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করতে হয় না, তা মরে যায়। 'মুক্ত রাষ্ট্র' কথাটিকে আন্দোলকেরা যে মধ্যে মধ্যে ন্যায্যতই ব্যবহার করে থাকেন সেদিক থেকে এবং তার চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা, উভয় দিক থেকেই কথাটার মূল্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে এ থেকে, অবিলম্বে রাষ্ট্র উচ্ছেদের জন্য তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের দাবিটারও।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ঐতিহাসিক আবির্ভাবকাল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায় সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ন্যূনাধিক অস্পষ্টভাবে ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে, ঐতিহাসিক রূপে আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে শুধু তখনই যখন তার বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অবস্থা বর্তমান। অপরাপর প্রতিটি সামাজিক প্রগতির মতোই তা সম্ভবপর হয় এই জন্য নয় যে, লোকে বুঝতে পারছে, শ্রেণীর অস্তিত্ব ন্যায়, সমানাধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী, এ শ্রেণী-বিলোপের ইচ্ছা দ্বারাই কেবল নয়, সম্ভবপর হয় কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে। শোষক ও শোষিত শ্রেণী, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ ছিল পূর্বতন কালের উৎপাদনের অপরিণত সীমাবদ্ধ বিকাশের অপরিহার্য পরিণাম। সকলের অস্তিত্বের জন্য কোনো ক্রমে যেটুকু দরকার তার চেয়ে কেবল অতি অল্পরিমাণ উদ্বৃত্ত যতদিন উৎপন্ন হচ্ছে সমগ্র সামাজিক মেহনত দ্বারা, সেই হেতু সমাজ-সদস্যদের বিপুল অধিকাংশের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সময় যতদিন খেয়ে যাচ্ছে মেহনতের পিছনে, ততদিন অনিবার্যভাবেই এ সমাজ বিভক্ত থাকছে শ্রেণীতে। পুরোপুরি মেহনতের যারা বাঁধা গোলাম, সেই বিপুল অধিকাংশের পাশাপাশি উদিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রম থেকে মুক্ত একটা শ্রেণী, যারা সমাজের সাধারণ বিষয়গুলির দেখাশোনা করে, যেমন শ্রম পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্ম, আইন, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি। সুতরাং শ্রম-বিভাগের নিয়মটাই আছে শ্রেণী-বিভাগের মূলে। কিন্তু তাতে করে বলাৎকার ও লুণ্ঠন, বুজরুকি ও জুয়াচুরি দ্বারা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পাদন আটকায় না। শাসক শ্রেণী একবার আধিপত্য পাবার পর শ্রমিক শ্রেণীর বিনিময়ে তার ক্ষমতা সংহত করা,

সামাজিক নেতৃত্বটাকে জনগণের তীব্রতর শোষনে পরিণত করা, এ সব তার আটকায় না।

কিন্তু এ স্বীকৃতি অনুসারে শ্রেণী-বিভাগের যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে, তবে তা শুধু একটা বিশেষ যুগের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে। এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণী বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয় যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসক শ্রেণী কেবল নয়, যে কোনো রকম শাসক শ্রেণীরই এবং সেই হেতু, শ্রেণী-ভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম। সুতরাং, তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদনেরউপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দকল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক আধিপত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিকাশের প্রতিবন্ধক।

এ সীমায় এখন আমরা পৌঁছেছি। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা স্বয়ং বুর্জোয়াদের কাছেও আর গোপন নয়। তাদের অথনৈতিক দেউলিয়াপনার আবির্ভাব ঘটছে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর। প্রতিটি সংকটেই সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে তারই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের চাপে — তাকে সে আর ব্যবহার করতে পারছে না, অসহায়ের মোত সে এই অদ্ভুত স্ববিরোধের সম্মুখীন যে, উৎপাদকদের ভোগ্য কিছুই নেই কেননা খরিদ্দার নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে নিগড় চাপিয়েছিল তা ফেটে বেরচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের সম্প্রসারণী শক্তি। উৎপাদন-শক্তির অবিচ্ছিন্ন নিয়ত ত্বরান্বিত বিকাশ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের প্রায় সীমাহীন বৃদ্ধির একমাত্র পূর্বসর্ত হল এই সব নিগড় থেকে উৎপাদন-উপায়ের মুক্তি। শুধু তাই নয়। উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের ফলে শুধু যে উৎপাদনের বর্তমান কৃত্রিম বাধাগুলি দূর হয়ে যায় তাই নয়, দূর হয় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের সেই প্রত্যক্ষ অপচয় ও সর্বনাশ, যা বর্তমানে উৎপাদনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং সংকটকালে যা সর্বোচ্চে ওঠে। অধিকন্তু, আজকের শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারের অবসান করে তা উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের একটা বড়ো অংশকে উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ সমাজের জন্য। সমাজীকৃত উৎপাদন দ্বারা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বৈষয়িকভাবে পর্যাপ্ত এবং দিন দিন পরিপূর্ণতর একটা অস্তিত্বই শুধু নয়, সকলের কায়িক ও মানসিক বৃত্তির অবাধ বিকাশ ও প্রয়োগের নিশ্চিতি-দেওয়া একটা অস্তিত্ব অর্জনের যে সম্ভাবনা, সে সম্ভাবনা এই প্রথম এলেও এসে গেছে।*৫২

সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য-উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের ওপর উৎপন্নের আধিপত্যের। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে ধারাবাহিক নির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়। একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে তফাৎ হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে। জীবনধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এযাবৎ তার ওপর আধিপত্য করেছে সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে — এই প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃতির সত্যকার সচেতন প্রভু এই কারণে যে স্বীয় সমাজ-সংগঠনের প্রভু সে হতে পারল। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অজ্ঞাতসারে তার সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর আধিপত্য করেছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সঙ্গে, এবং সেই হেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ। মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আবশ্যিকতা রূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বহির্ভূত বাস্তব শক্তিগুলি এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমসচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফলপ্রসব করবে। এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষেপ রূপরেখার সারসংকলন করা যাক।

১। মধ্যযুগীয় সমাজ — ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী ; সেই হেতু আদিম, অশোভন, নগণ্য, ক্রিয়া তাদের খর্বিত। হয় স্বয়ং উৎপাদক নয় তার সামন্ত প্রভুর আশু ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ভোগের ওপর যদি কখনো একটা উদ্বৃত্তি ঘটে কেবল তখনই সে উদ্বৃত্তিটা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, বিনিময়ের মধ্যে আসে। সুতরাং পণ্যের উৎপাদন নিতান্ত তার শৈশবে। তবু তখনই তার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় নিহিত সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য।

২। পুঁজিবাদী বিপ্লব — প্রথমে সরল সমবায় ও কারখানার সাহায্যে শিল্পের রূপান্তর। এযাবৎ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-

উপায়গুলির বড়ো বড়ো কারখানার মধ্যে কেন্দ্রীভবন। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে তাদের রূপান্তর — এ রূপান্তরে বিনিময়ের ধরন মোটের ওপর অপ্রভাবিত। দখলের পূবর্তন ধরনগুলিই বহাল। পুঁজিপতির উদয়। উৎপাদন-উপায়ের মালিক হিসাবে সে উৎপন্নকেও দখল করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে। উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একটা সামাজিক কাজ। বিনিময় ও দখল থেকেই যায় ব্যক্তিগত কাজ, এক একটা ব্যক্তির ব্যাপার। সামাজিক উৎপন্ন দখল করে ব্যক্তি পুঁজিপতি। মৌলিক বিরোধ, তা থেকে অন্য সবকিছু বিরোধের উদয়, যার মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ এবং আধুনিক শিল্প যা উদ্‌ঘাটিত করছে।

ক। উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের জন্য আজীবন মজুরি-শ্রমের ব্যবস্থা। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈরিতা।

খ। পণ্য-উৎপাদন যে নিয়মগুলির অধীন সেগুলির বর্ধমান আধিপত্য ও ক্রমাধিক কার্যকারিতা। বেপরোয়া প্রতিযোগিতা। এক একটা ফ্যাক্টরিতে সমাজীকৃত সংগঠন এবং সামগ্রিক উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।

গ। একদিকে, প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত কলওয়ালার পক্ষে যা বাধ্যতামূলক, যন্ত্রের সেই ক্রমোন্নতি এবং তার অনুপূরক হিসাবে শ্রমিকদের নিয়ত বর্ধমান কর্মচ্যুতি। শিল্পের মজুত বাহিনী। অন্যদিকে, — এটাও প্রতিযোগিতার ফলে — প্রতিটি কলওয়ালার পক্ষে বাধ্যতামূলক উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার। দুদিকেই উৎপাদন-শক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ, চাহিদার তুলনায় জোগানের আধিক্য, অতি-উৎপাদন, বাজার জাম, প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট, পাপ চক্র : এদিকে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের আধিক্য — ওদিকে কর্মহীন ও জীবিকাহীন শ্রমিকদের আধিক্য। কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুটি কারিকা একত্রে সক্রিয় হতে অক্ষম কারণ উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উৎপাদন-শক্তিকে আটকে রাখে কাজ থেকে এবং উৎপন্নকে আটকে রাখে সঞ্চালন থেকে — যদি না তারা প্রথমে পরিণত হয় পুঁজিতে, কিন্তু এই অতি আধিক্যেই তা অসম্ভব। এ বিরোধ বেড়ে ওঠে এক অদ্ভুত স্তরে। বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উৎপাদন-পদ্ধতি। নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করতে অসামর্থ্যের দ্বারা বুর্জোয়ারা অভিযুক্ত।

ঘ। উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের আংশিক স্বীকৃতি দিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বাধ্য হয়। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতে নেয় প্রথমে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, পরে ট্রাস্ট, অতঃপর রাষ্ট্র। অনাবশ্যক শ্রেণী রূপে প্রমাণিত হয় বুর্জোয়ারা। তাদের সামাজিক ক্রিয়ার সবই এখন চলে বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা।

৩। প্রলেতারীয় বিপ্লব — বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে। এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজিরূপ চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত করে তাদের সমাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ কাজ করে যাবার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কাল-ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু — মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটিকে পুরোপুরি বোঝা, এবং সে কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিয়েতের সাধন করার কথা তার অবস্থা ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা আজকের নিপীড়িত প্রলেতারীয় শ্রেণীকে, এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক যে প্রকাশ সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।

এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত ১৮৭৭ সালে প্যারিসে ফরাসী ভাষায় পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৮৮০ সালে, জার্মান ভাষায় জুরিখে ১৮৮৩ সালে, বার্লিনে ১৮৯১ সালে এবং ইংরেজি ভাষায় লন্ডনে ১৮৯২ সালে

১৮৯২ সালের প্রামাণ্য ইংরেজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

*১) Varwarts — গোথা ঐক্য কংগ্রেসের পর জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মুখপত্র। প্রকাশিত হয় লাইপজিগ থেকে ১৮৭৬ — ১৮৭৮ সালে। — সম্পাঃ

*২) 'মার্ক' — জার্মানির প্রাচনী গ্রামগোষ্ঠী। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইখানির প্রথম জার্মান সংস্করণের সংযোজনীতে এঙ্গেলস পূর্বোক্ত শিরোনামায় পুরাকাল থেকে শুরু করে জার্মান কৃষকসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। — সম্পাঃ

*৩) Sub judice — বিচারসাপেক্ষ। — সম্পাঃ

*৪) অজ্ঞেয়বাদ — (গ্রীক agnostos থেকে, অর্থ অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত) — একটি দার্শনিক মতবাদ ; আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে কিছু জানা সম্ভব নয়, এই দাবিতে অজ্ঞেয়বাদীরা হয় বিশ্বের অস্তিত্বই অস্বীকার করে (ইংরেজ দার্শনিক হিউম), নয়ত বাস্তব কোনো জিনিসকে জানতে পারার সম্ভাবনাই মানে না (জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট)। — সম্পাঃ

*৫) স্কলাস্টিজ্‌ম্‌ — মধ্য যুগে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত ধর্মীয় ভাববাদী দর্শনের প্রধান ধারার সাধারণ নাম।

ধর্মতত্ত্ব সেবায় সমর্পিত এ দর্শন প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বের বাস্তবতা নিয়ে কোন গবেষণা করত না, তার ভিত্তি ছিল কেবল খ্রীষ্টীয় গির্জার আপ্তবাক্য, তারই সাধারণ নীতিগুলি থেকে জল্পনামূলক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত টানা ও লোকের আচরণ বিধি নির্দেশের চেষ্টা করত। স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান প্রতিনিধি দুনস স্কোটের মতবাদের মধ্যেই তার পতনের সবকিছু উপাদান তখনই দেখা গিয়েছিল। দুনস স্কোট নামবাদের সমর্থক রূপে এগিয়ে আসেন — মার্কসের মতে এ নামবাদ ছিল বস্তুবাদের প্রথম অভিব্যক্তি। — সম্পাঃ

*৬) নামবাদ (nominalism) — ল্যাটিন nomen (নাম) থেকে উদ্ভব। মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি ধারা, এই দার্শনিকেরা প্রচার করে চলতেন, জাতিগত (generic) প্রত্যয় হল আসলে সমধর্মী বস্তুসমূহের নামান্তর। — সম্পাঃ

*৭) Qual — দার্শনিক কথার খেলা। Qual কথার আক্ষরিক অর্থ যন্ত্রণা, একটা বেদনা যা থেকে কোনো একটা কর্মের প্রেরণা। এই জার্মান শব্দটি মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যেমে ল্যাটিন qualitas-এর (গুণ) কিছুটা অর্থও আরোপ করেছেন। বাইরে থেকে দেওয়া যন্ত্রণার পরিবর্তে তাঁর qual হল বেদনার্ত বস্তু, সম্পর্ক বা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ থেকে উদ্ভূত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকাশকে অগ্রসর করার মতো এক কারিকা। (ইংরাজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

*৮) বড় হরফ মার্কসের। — সম্পাঃ

*৯) আস্তিক্যবাদী (theistic, theism বিষয়ক) — একটি ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ, তাতে ব্যক্তিস্বরূপ এক ঈশ্বরের, বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকৃত। — সম্পাঃ

*১০) deism — ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ ; এতে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণা নেই, কিন্তু জগতের এক নির্ব্যক্তিক আদি কারণ রূপে ঈশ্বর-ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানা হয়। — সম্পাঃ

*১১) Marks und Engels, Die heilige Familie, Frankfort a. M. 1845, S. 201-204. (এঙ্গেলসের টীকা।)

*১২) স্যালভেশন আর্মি — ধর্মীয় জনহিতৈষী সংগঠন, ১৮৬৫ সালে ইংলন্ডে এটির প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়ম বুটস্‌। — সম্পাঃ

*১৩) P. S., Laplace Traite de mecanique celeste. Vol. I–V. Paris, 1799-1825. — সম্পাঃ

*১৪) 'এ প্রকল্পের কোনো আবশ্যক আমার ছিল না।' — সম্পাঃ

*১৫) আদিতে ছিল কর্ম — গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে। — সম্পাঃ

*১৬) ১৬৮৮-১৬৮৯ সালের রাষ্ট্রীয় কুদেতার পর ইংলন্ডে ভূমি অভিজাত ও ফিনান্স বুর্জোয়াদের মধ্যে আপোসের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ইংরেজ ইতিহাসবিদ্যায় গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব আখ্যা পায়। — সম্পাঃ

*১৭) গোলাপের যুদ্ধ (১৪৫৫-১৪৮৫) — সিংহাসন লাভের জন্য দুই ইংরেজ সামন্ত বংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ। এদের এক পক্ষ ইয়র্কগণ — তাদের প্রতীকে অঙ্কিত ছিল শাদা গোলাপ, অপর পক্ষ লাঙ্কেস্টারগণ — এদের প্রতীকে ছিল রক্তিম গোলাপ। ইয়র্কদের পক্ষে জড়ো হয়েছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর বিকশিত দক্ষিণের বৃহৎ সামন্তদের একাংশ, নাইট সম্প্রদায় ও নগরবাসীরা, লাঙ্কেস্টারদের সমর্থন করে উত্তরের কাউন্টিগুলোর সামন্ত অভিজাতরা। যুদ্ধে প্রাচীন সামন্ত বংশগুলি প্রায় সমূহ ধ্বংস পায় ও ইংলন্ডে স্বৈর শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ট্যুডর বংশ ক্ষমতা লাভ করে। — সম্পাঃ

*১৮) তাগড়াই কিন্তু হিংস্র ছোকরা। — সম্পাঃ

*১৯) কার্থেজীয় দর্শন — কার্থেজীয় বস্তুবাদ — ১৭শ শতকের ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (ল্যাটিনে — Cartesius)-এর দর্শন থেকে তাঁর যে অনুগামীরা বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত টানতেন তাঁদের মতবাদ। — সম্পাঃ

*২০) 'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্র' — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে ১৭৮৯ সালের আগস্টে ফ্রান্সের সংবিধান সভায় গৃহীত ঘোষণাপত্র। এতে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার, নিপীড়নের প্রতিরোধের অধিকার ইত্যাদি ঘোষিত হয়। — সম্পাঃ

*২১) লেখেন লন্ডন কিন্তু উচ্চারণ করেন কনস্টানটিনোপল। — সম্পাঃ

*২২) ইংলন্ডে প্রথম নির্বাচনী সংস্কারের খসড়া আইন পার্লামেন্টে পেশ করা হয় ১৮৩১ সালের মার্চে ও গৃহীত হয় ১৮৩২ সালের জুন মাসে। এ সংস্কারে ভূমিপতি অভিজাত, ব্যাঙ্কার ও কুসীদজীবীদের রাজনৈতিক একচেটিয়ার অবসান হয়। সার্বজনীন নির্বাচনী অধিকারের জন্য গণ শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যালরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ও ১৮৩২ সালের আইনে উঁচু হারে সম্পত্তি সর্ত আরোপ করা হয়, শহরে ১০ পাউন্ড ও কাউন্টিতে ৫০ পাউন্ড, এবং পার্লামেন্টের দরজা উন্মুক্ত হয় কেবল শিল্প বুর্জোয়াদের জন্য। প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা আগের মতোই রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত থাকে। — সম্পাঃ

*২৩) শস্য আইনস নাকচের বিল গৃহীত হয় ১৮৪৬ সালের জুন মাসে। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সঙ্কুচিত বা নিষিদ্ধ করার এই তথাকথিত শস্য আইন ইংলন্ডে চালু হয় বৃহৎ ভূস্বামী ল্যান্ডলর্ডদের স্বার্থে। শস্য আইন নাকচের বিল গৃহীত হওয়ায় বাণিজ্যের স্বাধীনতা ধ্বনি নিয়ে যে শিল্প বুর্জোয়ারা শস্য আইনের বিরুদ্ধে লড়ছিল তাদের জয় সূচিত হয়। — সম্পাঃ

*২৪) চার্টিস্টবাদ — দুর্বিষহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অধিকারহীনতার ফলে উদ্ভূত ইংরেজ শ্রমিকদের গণ বিপ্লবী আন্দোলন। ১৯ শতকের তিরিশের দশকের শেষে বড়ো বড়ো জনসভা ও শোভাযাত্রা মারফত আন্দোলন শুরু হয়ে মাঝে মাঝে বিরতি সহ ৫০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত চলে।

চার্টিস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ সুসঙ্গত বিপ্লবী প্রলেতারীয় নেতৃত্ব ও পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির অভাব। — সম্পাঃ

*২৫) ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর লুই বোনাপার্ট কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে রাষ্ট্রীয় কুদেতা'র ফলে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টপন্থী আমল শুরু হয় তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

*২৬) জোনাথান ভাই — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগে এই নামে অভিহিত করা হত, পরে যা দাঁড়িয়েছে 'সাম খুড়ো'। — সম্পাঃ

*২৭) রিভাইভ্যালিজ্‌ম্‌ — গত শতকের এ আন্দোলন ধর্মের বিলীয়মান প্রভাব উদ্ধারের চেষ্টা করে। মুডি ও স্যাঙ্কি নামক দুই জন মার্কিন প্রচারক তার সংগঠক ছিলেন। — সম্পাঃ

*২৮) এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও উগ্রজাতিবাদের অহমিকা এক অতি কুপরামর্শদাতা। হাল আমল পর্যন্ত সাধারণ ইংরেজ কলওয়ালা মনে করত নিজ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা ইংরেজের পক্ষে লজ্জার ; 'বেচারা' বিদেশীরা ইংলন্ডে বসতি স্থাপন করে তার হাত থেকেই মাল নিয়ে বিদেশে বিক্রি করার ঝামেলা নিচ্ছে, এতে তার আর কিছু নয় বরং গর্বই হত। এটা তার কখনো নজরে আসেনি যে, এই বিদেশীরা, প্রধানত জার্মানরা, এই ভাবে আমদানি রপ্তানির, বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা বড়ো অংশের ওপর দখল পাচ্ছে এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে প্রায় একমাত্র কেবল উপনিবেশে, চীনে, যুক্তরাষ্ট্রে ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এও সে খেয়াল করেনি যে, এই জার্মানদের সঙ্গে বিদেশে অন্যান্য জার্মানরা ব্যবসা করে ক্রমশ সারা দুনিয়ায় বাণিজ্যিক উপনিবেশের একটা পুরো জাল গড়ে তুলছে। কিন্তু জার্মানি যখন প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যি করেই রপ্তানির জন্য মাল তৈরি করতে লাগল তখন শস্য-চালীন দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর কলওয়ালাদেশরূপে অত অল্প সময়ের মধ্যে তার রূপান্তরে এই বাণিজ্যিক জালটা তার চমৎকার কাজে লেগেছিল। তারপর, প্রায় দশ বছর আগে, বৃটিশ কলওয়ালারা ভয় পেয়ে তার রাষ্ট্রদূত ও কন্সালদের প্রশ্ন করে, কেন তাদের করিদ্দাররা টিকছে না। সকলে একবাক্যে জবাব দেয় : ১) আপনারা খরিদ্দারদের ভাষা শেখেন না, ভাবেন তাদেরই উচিত আপনাদের ভাষায় কথা বলা ; ২) খরিদ্দারদের চাহিদা অভ্যাস রুচি ইত্যাদির সঙ্গেও মানিয়ে চলতে চান না, আশা করেন আপনাদের ইংরাজি চাহিদা অভ্যাস রুচি অনুসারেই সে চলবে। (এঙ্গেলসের টীকা)।

*২৯) ক্যাথিডার-সোশ্যালিজ্‌ম্‌ — জার্মানিতে ১৯শ শতকের ৭০-৮০-র দশকে উত্থিত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের একটি ধারা। এই দারার প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে সমাজতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া উদারনীতিক সংস্কারবাদের প্রচার করত। — সম্পাঃ

*৩০) পার্বণ পেরিয়ে যাবার পর। — সম্পাঃ

*৩১) জাড্যের শক্তি। — সম্পাঃ

*৩২) ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি এই : 'অধিকারের চিন্তা, অধিকারের ধারণা অবিলম্বেই স্বীকৃতি আদায় করে নিল, এর বিরুদ্ধে অন্যায়ের পুরাতন কাঠামো দাঁড়াতে পারল না। সুতরাং এই অধিকার বোধের ওপর এবার একটা সংবিধান প্রতিষ্ঠা হল, এখন থেকে সবকিছুরই ভিত্তি হবে তা। সূর্য যবে থেকে আকাশে এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহ, ততদিনের মধ্যে এ দৃশ্য দেখা যায়নি যে, মানুষ দাঁড়াল তার মাথার ওপর অর্থাৎ ভাবনার ওপর এবং বাস্বকে নির্মাণ করতে লাগল তার এই ভাবনা অনুযায়ী। আনাক্সেইগরস প্রথম বলেছিলেন, Nous অর্থাৎ যুক্তির শাসনাধীন দুনিয়া। কিন্তু এখন এই সর্বপ্রথম মানুষ স্বীকার করতে পারল যে, মানসিক বাস্তবতার শাসিত হওয়া উচিত ভাবনার দ্বারা। এবং সে হল এক অপরূপ অরুণোদয়। সমস্ত চিন্তক প্রাণীই এই পবিত্র দিনটির উদ্‌যাপনে অংশ নেন। একটা অপূর্ব আবেগে তখন আন্দোলিত হয় মানুষ, যুক্তির উদ্দীপনায় বিশ্ব ছেয়ে যায়, এ যেন এল বিশ্বের সঙ্গে স্বর্গীয় নীতির মিলনের দিন।' (হেগেল, 'ইতিহাসের দর্শন', ১৮৪০, ৫৩৫পৃঃ)। লোকান্তরিত অধ্যাপক হেগেল কর্তৃক এরূপ অন্তর্ঘাতী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক প্রচারের বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট-বিরোধী আইনটা অবিলম্বে প্রযোজ্য নয় কি? (এঙ্গেলসের টীকা।)

*৩৩) রুসোর তত্ত্ব অনুসারে গোড়াতে মানুষেরা স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করত ও সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ও সম্পত্তির অসাম্য বৃদ্ধির কারণের স্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে লোকেরা সরে আসে নাগরিক পরিস্থিতিতে এবং সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অসাম্যের আরো বৃদ্ধির ফলে সামাজিক চুক্তির লঙ্ঘন ঘটে এবং নতুনতর একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই শেষোক্ত পরিস্থিতির অবসান করাতে হবে এক সুবিবেচক রাষ্ট্রকে, যা নতুন সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। — সম্পাঃ

*৩৪) আনাব্যাপটিস্ট (পুনদীক্ষিত) — ১৬ শতকে জার্মানি ও নেদার্ল্যান্ডেস্ উত্থিত এক ধর্মসম্প্রদায়ের অনুগামীরা। এই ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্যদের আনাব্যাপটিস্ট বলা হত কারণ তারা সাবালক অবস্থায় দ্বিতীয়বার দীক্ষার দাবি তোলে। আনাব্যাপটিস্টদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষক হস্তশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানী, ১৫২৪-১৫২৫ সালের কৃষক সমরে এরা টমাস ম্যুনৎসারের নেতৃত্বাধীন অধিকতর বিপ্লবী অংশটায় যোগ দেয়। — সম্পাঃ

*৩৫) 'খাঁটি লেভেলার' বা 'খনক' বলে যাদের অভিহিত করা হত এঙ্গেলস এখানে তাদের কথা বলছেন। ১৭শ শতকে ইংলন্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবে এরা শহুরে ও গাঁয়ের গরিবদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। — সম্পাঃ

*৩৬) এঙ্গেলস এখানে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী টমাস মোর (১৬শ শতাব্দী) ও তম্মাসো কাম্পানেল্লার (১৭শ শতাব্দী) রচনার কথা বলছেন। — সম্পাঃ

*৩৭) সন্ত্রাসের কাল — জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের পব (জুন ১৭৯৩—জুলাই, ১৭৯৪) যখন জিরন্ডপন্থী ও রাজপন্থীদের প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জ্যাকোবিনরা বিপ্লবী সন্ত্রাস প্রগে করে।

ডিরেক্টরেট — গঠিত হয় পাঁচ জন ডিরেক্টর নিয়ে, প্রতিবছরে এদের একজনকে পুনর্নির্বাচিত হতে হত) ১৭৯৪ সালে জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী একনায়কত্বের পতনের পর ১৭৯৫ সালের সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের কার্যনির্বাহক ক্ষমতার নেতৃসংস্থা ; এটি টিকে থাকে ১৭৯৯ সালে ডিরেক্টরেট এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে। — সম্পাঃ

*৩৮) ১৮শ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের 'স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব' এই ধ্বনির কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

*৩৯) ফরাসী বিরোধী ষষ্ঠ জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংলন্ড, প্রাশিয়া প্রভৃতি) সম্মিলিত বাহিনী প্যারিস প্রবেশ করে ১৮১৪ সালের ৩১শে মার্চ। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং স্বয়ং নেপোলিয়ান সিংহাসন ত্যাগের পর এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হতে বাধ্য হন। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের প্রথম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে ফ্রান্সে।

একশ দিন — ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চ এলবার নির্বাসন থেকে ফিরে প্যারিস প্রবেশের মুহূর্ত থেকে ওয়াটার্লুতে পরাজয়ের পর ঐ বছরেরই ২২শে জুন দ্বিতীয়বার সিংহাসন ত্যাগ পর্যন্ত নেপোলিয়নের স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের পর্ব। — সম্পাঃ

*৪০) ওয়াটার্লুতে (বেলজিয়ম) ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন ওয়েলিংটনের নেতৃত্বাধীন ইঙ্গ-ওলন্দাজ সৈন্য এবং ব্লুখারের নেতৃত্বাধীন প্রুশীয় সৈন্যের নিকট নেপোলিয়নের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়। ফরাসী বিরোধী সপ্তম জোটের (ইংলন্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি) চূড়ান্ত জয়লাভ এবং নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের পতনে এ সংঘর্ষ নির্ধারক ভূমিকা নেয়। — সম্পাঃ

*৪১) 'মনে ও আচরণে বিপ্লব' শীর্ষক একটি স্মারকলিপি থেকে (২১ পৃষ্ঠা), এটি রচিত হয় 'ইউরোপের সমস্ত রেড রিপাবলিকান, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের' উদ্দেশ্যে এবং ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার এবং 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের' নিকট প্রেরিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

*৪২) ঐ, পৃঃ ২২। (এঙ্গেলসের টীকা।)

*৪৩) বিজ্ঞান বিকাশের আলেকজেন্ড্রীয় যুগ হল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মিশরের আলেকজেন্ড্রিয়া শহর থেকে কথাটার উৎপত্তি। সেকালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল আলেকজেন্ড্রিয়া। আলেকজেন্ড্রীয় যুগে গণিত (ইউক্লিড, আর্কিমীডীস), ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ইত্যাদির প্রভূত বিকাশ হয়। — সম্পাঃ

*৪৪) গ্যেটের 'ফাউস্ট' পুস্তকের মেফিস্টোফিলিসের কথা। — সম্পাঃ

*৪৫) দখলের রূপ একই থাকলেও তার চরিত্রে উপরি-বর্ণিত কারণে উৎপাদনের মতোই সমান একটা বিপ্লব যে ঘটে যায় তা এ প্রসঙ্গে দেখানোর তেমন প্রয়োজন নেই। আমি আমার নিজের উৎপন্ন দখল করছি না অন্যের উৎন্ন দখল করছি, তা অবশ্যই অতি পৃথক দুটো জিনিস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভ্রূণাকারে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যার মধ্যে নিহিত সেই মজুরি-শ্রম অতিশয় প্রাচীন ; বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত রূপে তা বহু শতাব্দী যাবৎ দাস শ্রমের পাশাপাশি বর্তমান। কিন্তু সে ভ্রূণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথারীতি বিকশিত হতে পারল শুধু তখন, যখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পূর্বসর্তগুলি জোগানো হল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

*৪৬) শেষের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (এঙ্গেলসের টীকা)। এঙ্গেলস এখানে তাঁর নিজের রচনা 'মার্ক' উদ্ধৃত করেন, যা এই সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি। — সম্পাঃ

*৪৭) তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ : ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলমস কর্তৃক আমেরিকা এবং ১৪৯৮ সালে পোর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতের সমুদ্র পথ আবিষ্কার। — সম্পাঃ

*৪৮) — ভারতবর্ষ ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া এবং উপনিবেশিক বাজার দখলের জন্য ১৭শ ও ১৮শ শতকে বৃহৎ বৃহৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে উপর্যুপরি যুদ্ধ চলে তার কথা বলা হচ্ছে। প্রথম দিকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ছিল ইংলন্ড ও হল্যান্ড (১৬৫২-১৬৫৪, ১৬৬৪-১৬৬৭ এবং ১৬৭২-১৬৭৪ সালের ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধগুলি ছিল টিপিক্যাল বাণিজ্য যুদ্ধ), পরে নির্ধারক সংগ্রাম জ্বলে ওঠে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। এই সবকটি যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে ইংলন্ড, ১৮শ শতকের শেষাশেষি তার হাতে কেন্দ্রীভূত হয় প্রায় সমস্ত বিশ্ববাণিজ্য। — সম্পাঃ

*৪৯) 'ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' (Sonnenschein & Co.), পৃঃ ৮৪। (এঙ্গেলসের টীকা।)

*৫০) প্রমেথিউস — গ্রীক পুরাকথার এক বীর। দেবগণের কাছ থেকে অগ্নি হরণ করে এনে তিনি মানুষদের দেন। শাস্তি হিসাবে জিউস তাঁকে শৈলে শৃঙ্খলিত করে রাখেন এবং ঈগল তাঁর যকৃত ভক্ষণ করে। — সম্পাঃ

*৫১) বলছি 'করতে হবে' কেননা, উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় যখন সত্য করেই জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলি কর্তৃক পরিচালন ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাবে, এবং সেই হেতু তাদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যখন অর্থনৈতিকভাবে অনিবার্য হবে, কেবল তখনই একটা অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটবে — যদি সে কাজ আজকের এই রাষ্ট্রই করে তাহলেও, — ঘটবে সমস্ত উৎপাদন-শক্তির সমাজীকরণের প্রাথমিক একটা পদক্ষেপ। কিন্তু ইদানীং, বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে লেগেছেন, তখন থেকে একধরনের মেকি সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যা থেকে থেকেই এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত পদলেহনে অধঃপতিত হচ্ছে, এমনকি বিসমার্কী ধরনের রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমেত যে কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাকেই তারা ঘোষণা করছে সমাজতন্ত্র বলে। তামাক শিল্প রাষ্ট্র দখল করলে যদি সমাজতন্ত্র হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন ও মেত্তেরনিখকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। বেলজিয়ম রাষ্ট্র যদি নিতান্ত সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তার প্রধান রেলপথ নিজেই নির্মাণ করে ; কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যতার ফলে নয়, নিতান্তই যুদ্ধের সময় অনায়াসে হাতে রাখা যাবে বলে, সরকারের পক্ষে ভোটদায়ী গড্ডলিকারূপে রেলকর্মচারীদের গড়ে তোলার জন্য, এবং বিশেষ করে পার্লামেন্টারী ভোটের তোয়াক্কা না রেখে নিজের জন্য একটা নতুন আয়ের উৎস তৈরির উদ্দেশ্যে যদি বিসমার্ক প্রধান প্রধান প্রুশীয় রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তাহলে কোনো অর্থেই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না। নইলে, রাজকীয় নৌ কোম্পানি, রাজকীয় চীনামাটি কারখানা, তথা সৈন্যবাহিনীর দর্জি-পোষাক প্রতিষ্ঠানকেও বলতে হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি তৃতীয় ফ্রিদরিখ-ভিলহেলমের রাজত্বকালে এক ধূর্ত যা গুরুত্বসহকারে প্রস্তাব করেছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক বেশ্যালয়গুলি গ্রহণের সে ব্যাপারটা পর্যন্ত হয় সমাজতান্ত্রিক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

*৫২) পুঁজিবাদী চাপের তলেও আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের বিপুল সম্প্রসারণী শক্তির একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে গোটাকতক সংখ্যা থেকে। মিঃ গিফেনের মতে, গ্রেট বৃটেন ও আয়র্ল্যান্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যায় :

১৮১৪ সাল — ২২০,০০,০০,০০০ পাউন্ড,

১৮৬৫ সাল — ৬১০,০০,০০,০০০ পাউন্ড,

১৮৭৫ সাল — ৮৫০,০০,০০,০০০ পাউন্ড।

সংকটকালে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের অপচয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭৩—১৮৭৮ সালের সংকটে কেবল জার্মান লৌহ শিল্পেরই মোট ক্ষতির পরিমাণ ২,২৭,৫০,০০০ পাউন্ড বলে দ্বিতীয় জার্মান শিল্প-কংগ্রেসে (বার্লিন, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮) উল্লিখিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)